Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের যেরুপ দ্বীনের দা'য়ী হওয়া উচিৎ।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিয়া আক্তার রোজা

রোলঃ 23090121593

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের যেরুপ দ্বীনের দা'য়ী হওয়া উচিৎ।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিয়া আক্তার রোজা

রোলঃ 23090121593

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমাদের যেরুপ দ্বীনের দা'য়ী হওয়া উচিৎ। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারিয়া আক্তার রোজা, আইডিঃ 23090121593 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমাদের যেরুপ দ্বীনের দা'য়ী হওয়া উচিৎ। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফারিয়া আক্তার রোজা

আইডিঃ 23090121593

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 8

■ অধ্যায় ১: দাওয়াহ কী এবং কেনো 9

১.২ দাওয়াহ কী এবং এর মূল লক্ষ্য 9

১.৩ ইসলাম আসলে কাদের ধর্ম? 12

১.৪ ইসলামে দাওয়াহর গুরুত্ব 14

১.৫ দাওয়াহ ও দায়িত্বের সম্পর্ক:- 16

■ অধ্যায় ২: ইসলামে দাওয়াতের সূচনা 18

২.১ নবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত ও সামাজিক দাওয়াহ পদ্ধতি 18

২.২ ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াহ: পরিবার ও সমাজে আহ্বান 20

২.৩ সাহাবায়ে কেরামের সক্রিয় দাওয়াহ ও জীবন থেকে শিক্ষণীয় উদাহরণ 23

২.৪ তাবেঈন ও তাবে তাবেয়িনদের দাওয়াহ: যুগোপযোগী শিক্ষা 25

২.৫ দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্ব 27

■ অধ্যায় ৩: একজন দায়ী ব্যক্তির গুণাবলি 29

৩.১ সততা, ধৈর্য ও নম্রতা 29

৩.২ সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার 30

৩.৩ জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজ আলোকিত করা 32

৩.৪ দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিচয় 34

■ অধ্যায় ৪: পরিবারে দায়িত্ব 36

৪.১ পিতামাতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও আদর্শ আচরণ 36

৪.২ স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া 38

৪.৩ ঘরে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা 40

৪.৪ পরিবারে শিক্ষার ও নৈতিক গঠনের গুরুত্ব 41

■ অধ্যায় ৫: সমাজে দায়বদ্ধ ভূমিকা...42
৫.১ প্রতিবেশী ও কমিউনিটির কল্যাণে অবদান...42
৫.২ দরিদ্র, অসহায় ও এতিমদের প্রতি সদয় মনোভাব...43
৫.৩ — ন্যায়, মানবিকতা ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা..45
৫.৪ সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার...47
■ অধ্যায় ৬ : নারীর দাওয়াহিক ভূমিকা ও দায়িত্ব...49
৬.১ কুরআন ও সহীহ হাদিসে নারীর মর্যাদা ও দাওয়াহিক দায়িত্ব............................49
৬.২ নারীর দাওয়াহ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব...51
৬.৩ নারী সাহাবিদের দাওয়াহি অবদান...53
৬.৪ আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াহে সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ...55
■ অধ্যায় ৭ : আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা..58
৭.১ তাকওয়া, ইখলাস ও আত্মসংযম...58
৭.২ ইবাদতের মাধ্যমে দায়বদ্ধতার চর্চা...60
৭.৩ আমানত রক্ষা, জবাবদিহি ও পরকালীন দায়িত্ববোধ..62
■ অধ্যায় ৮: আধুনিক জীবনে দায়বদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ..64
৮.১ প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম ও তথ্য ব্যবহারে নৈতিকতা...64
৮.২ সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার...66
৮.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ, দেশপ্রেম ও উম্মাহর ঐক্য...69
■ অধ্যায় ৯: নেতৃত্ব, শিক্ষা ও দাওয়াহর প্রভাব...71
৯.১ ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বের নীতি...71
৯.২ নবী ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বমূলক শিক্ষা...73
৯.৩ শিক্ষা, দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারের সম্পর্ক..74

■ অধ্যায় ১০: শিক্ষণীয় বার্তা, উপসংহার ও সুপারিশ..77

১০.১ কুরআন ও সহীহ হাদিস থেকে অন্তর্দৃষ্টি..77

১০.২ নবী ﷺ, সাহাবা ও তাবেয়িনদের জীবন থেকে শিক্ষা 78

১০.৩ গবেষণার সারসংক্ষেপ ও বাস্তব প্রয়োগের দিকনির্দেশ..80

১০.৪ চূড়ান্ত অঙ্গীকার ও ব্যক্তিগত আত্মসমালোচনার দিক।..82

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবারের উপর এবং সকল সাহাবীদের উপর। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদের মানবজাতির কল্যাণে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।" (সূরা:আলে ইমরান: ১১০)

আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমতের মাধ্যমে এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা।" (সূরা: নাহল: ১২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৬১)

এই আয়াত ও হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি মুসলিম দায়ী—একজন দায়ীর মূল দায়িত্ব হলো — দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, নেক কাজে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করা। একজন সত্যিকারের দায়ী ইলাল্লাহ কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং নিজের আমল, চরিত্র ও জীবনাচরণের মাধ্যমে দ্বীনের সৌন্দর্য তুলে ধরেন। তাঁর নৈতিকতা, বিনয় ও আচার-ব্যবহারই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

এই গবেষণাতে দাওয়াতি দায়িত্বের গুরুত্ব কুরআন, সহীহ হাদিস, যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ । পাশাপাশি একজন দায়ী কিভাবে নৈতিক ও সুন্দর জীবন ধারণের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে পারে, তা তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ । এ গবেষণা শুধু সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; বরং দাওয়াতের পথে নিয়োজিত সবার জন্য উপকারী দিকনির্দেশনা হবে। পাঠক এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলে দুনিয়ায় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আখিরাতে সফলতার পাথেয় রচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

■ অধ্যায় ১: দাওয়াহ কী এবং কেনো

১.২ দাওয়াহ কী এবং এর মূল লক্ষ্য

প্রিয় পাঠক,
আমরা যখন "দাওয়াহ" শব্দটি শুনি, তখন আমাদের মনে প্রথমেই আসে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। কিন্তু এই আহ্বানটি কেবল মুখের কথা নয়, বরং এটি এক বিশাল দায়িত্ব, এক আমানত, এক জীবনব্যাপী মিশন।

"দাওয়াহ" (دعوة) শব্দটি এসেছে আরবি ক্রিয়া دعا – يدعو – دعوةً থেকে, যার অর্থ "ডাকা", "আহ্বান করা" বা "নিমন্ত্রণ জানানো"।
অর্থাৎ দাওয়াহ মানে হলো মানুষকে আহ্বান করা। কোথায়? আল্লাহর দিকে, তাঁর আনুগত্যে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেনঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ <
"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমতের মাধ্যমে এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা।" (সূরা নাহল: ১২৫)
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যে আহ্বান হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে; আবেগ বা কটুভাষায় নয়।।কারণ দাওয়াহের উদ্দেশ্য কারো উপর প্রভাব খাটানো নয়, বরং হৃদয়ে ঈমানের আলো পৌঁছে দেওয়া।

○ দাওয়াহের প্রকৃত অর্থ:-
ইসলামের পরিভাষায় দাওয়াহ মানে হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, যেন তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে, নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে, ও জীবন পরিচালনা করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। এটি কেবল ইসলাম প্রচার নয়; বরং এটি হলো মানুষকে সত্য চিনতে, বুঝতে ও তা গ্রহণ করতে সহায়তা করা।দাওয়াহ মানে শুধুমাত্র বক্তৃতা নয় বরং জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই দাওয়াহর অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً <

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতই হয়।"

— (সহীহ বুখারী: ৩৪৬১)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুমিনই দায়ী যে পরিমাণ জ্ঞানই তার থাকুক না কেন, সে যেন তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।এটাই দাওয়াহর মূল দৃষ্টিভঙ্গি "নিজে জানো, এবং জানাও।"

◇ দাওয়াহের মূল লক্ষ্য:-

দাওয়াহর উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় প্রচার নয়, বরং এটি আল্লাহর সৃষ্ট উদ্দেশ্যেরই ধারাবাহিকতা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ >

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

অতএব, মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা এই হচ্ছে দাওয়াহর মূল লক্ষ্য। দাওয়াহ কেবল মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা নয়; বরং তাদের হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা, আত্মাকে জাগিয়ে তোলা, এবং আল্লাহভীরুতা (তাকওয়া) ও ন্যায়ের চেতনা জাগ্রত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه >

"যে কেউ কাউকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করে, তার জন্য থাকবে তাদের সমান সওয়াব যারা সেই পথ অনুসরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৪)

এই হাদিস স্পষ্ট করে দিচ্ছে দাওয়াহ এমন এক দায়িত্ব, যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অসংখ্য মানুষের জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দিতে পারে, এবং সেই প্রতিটি কল্যাণের পুরস্কার তার আমলনামায় যুক্ত হয়।

◇ দাওয়াহর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভারসাম্য

একজন দায়ী ইলাল্লাহ যখন মানুষকে আহ্বান করেন, তখন তার দাওয়াহর তিনটি স্তর থাকা উচিতঃ

1. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাওয়াহ: যুক্তি, প্রমাণ ও কুরআনের আলোকে মানুষকে বোঝানো।
2. আখলাক ও আচরণের দাওয়াহ: নিজের চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা।

3. সেবা ও সহানুভূতির দাওয়াহ: সমাজে কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে উপস্থাপন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন এই তিন দাওয়াহর সমন্বয়—বক্তৃতায়, আচরণে ও করুণায়। তিনি কখনও কাউকে কঠোর ভাষায় দাওয়াহ দেননি; বরং কোমল হৃদয়ে আহ্বান করেছেন।
আল্লাহ তাঁকে বলেছেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ <
"আল্লাহর দয়ার কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন; আপনি যদি কঠোর ও রূঢ় হৃদয়ের হতেন, তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেত।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)
অতএব, দাওয়াহর সফলতা নির্ভর করে ভালোবাসা, কোমলতা, এবং আন্তরিকতার উপর।

◇ দাওয়াহর ফলাফল ও দায়

দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করা আমাদের উপর ফরজ; কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ <
"আপনার উপর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়ার।" (সূরা শুরা: ৪৮)
অর্থাৎ একজন দায়ী কেবল তার দায়িত্ব পালন করবে মানুষের হৃদয়ে ঈমান ঢোকানো তার কাজ নয়। সফলতা আসে তখনই, যখন আহ্বান করা হয় আল্লাহর জন্য, নিজের জন্য নয়।

◇ সারসংক্ষেপ

দাওয়াহ মানে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে। এর মূল লক্ষ্য হলো মানবজাতির আত্মিক জাগরণ, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। দাওয়াহ কেবল বক্তৃতা নয়; এটি এক জীবনদর্শন, যেখানে প্রতিটি আমল, প্রতিটি আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়।
একজন দায়ী ইলাল্লাহর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি গুণ: ইখলাস (আন্তরিকতা), হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও হুসনে আখলাক (উত্তম চরিত্র)।
ফলাফল আল্লাহর হাতে—আমাদের দায়িত্ব কেবল আহ্বান করা, বাকি হিদায়াত তিনি দান করেন যাকে চান।

১.৩ ইসলাম আসলে কাদের ধর্ম?

প্রিয় পাঠক,
আজকের পৃথিবীতে "ইসলাম" শব্দটি শোনা মাত্র অনেকের মনে যে ধারণাটি জাগে, তা হলো এটি কেবল "মুসলমানদের ধর্ম।" কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলাম কেবল কোনো জাতি, বংশ বা ভৌগোলিক গোষ্ঠীর ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত এক সর্বজনীন জীবনবিধান।

◇ ইসলাম শব্দের অর্থ ও মূল ভাব:-
"ইসলাম" (الإسلام) শব্দটি এসেছে আরবি ক্রিয়া أسلم – يسلم – إسلامًا থেকে, যার অর্থ "আত্মসমর্পণ করা", "আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণভাবে নত হওয়া।" অর্থাৎ ইসলাম মানেই হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর আদেশের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণই মানুষকে বানায় মুমিন, বানায় আল্লাহর অনুগত বান্দা।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেনঃ

> إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"
(সূরা আলে ইমরান: ১৯)
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন মানবজাতির জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। কোনো জাতি বা যুগের জন্য নয়; বরং আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত আল্লাহর সকল নবী একই ইসলামি দাওয়াতই দিয়েছেন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য।

◇ ইসলাম – সর্বজনীন ধর্ম:-
ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং এটি সেই চিরন্তন জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে প্রতিটি নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন।
কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

> شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য একই ধর্ম নির্ধারণ করেছেন, যা তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা আমি তোমার প্রতি (হে মুহাম্মদ) ওহি করেছি, এবং যা আমি ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এবং এতে বিভক্ত হবে না।" (সূরা আশ-শুরা: ১৩)
এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন সমস্ত নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন: আল্লাহর একত্ব, তাকওয়া, ন্যায় ও আনুগত্য। অতএব ইসলাম কেবল মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের জন্য নয়; বরং এটি হলো মানবজাতির প্রারম্ভ থেকে নির্ধারিত চূড়ান্ত জীবনবিধান, যার পূর্ণতা নবী ﷺ-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

○ ইসলাম: জাতি নয়, বিশ্বাসের বন্ধন:-

ইসলাম মানুষকে জাতি, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করে না। বরং ইসলাম মানুষকে এক করে একটি বিশ্বাসের পতাকাতলে
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ

> لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

"কোনো আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের, শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের বা কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।"
(মুসনাদ আহমাদ: ২৩৪৮৯; সহীহ তিরমিজি: ৩২৭০)

অতএব ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানবসমাজে জাতিগত বিভেদ নয়, বরং ন্যায়, সমতা ও তাকওয়ার শিক্ষা দেয়। এটি কেবল মুসলমানদের জন্য নয়; বরং যারা "আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ" করে তারা-ই প্রকৃত মুসলিম, যেই যুগ বা অঞ্চলেরই হোক না কেন।

○ ইসলাম – শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম

ইসলাম শব্দের আরেকটি তাৎপর্য হলো "সালাম" বা "শান্তি।"
অর্থাৎ ইসলাম মানেই হলো এমন জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে অভ্যন্তরীণ শান্তি দেয়, সমাজে কল্যাণ আনে, আর মানবতার মুক্তির পথ দেখায়।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

> يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

"আল্লাহ এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে।" (সূরা মায়িদা: ১৬)

অতএব ইসলাম শুধু উপাসনার ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দীন যেখানে আল্লাহর নির্দেশানুসারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এখানে প্রতিটি বিধান মানুষের মঙ্গলের জন্যই প্রেরিত।

◇ ইসলাম আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ। ইসলামের মর্মবাণী হলো

"আমার ইচ্ছা নয়, আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" এটাই প্রকৃত মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি। যখন মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষা, লালসা ও অহংকারকে ত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে বাস্তবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ <

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্ম করে, সে তো দৃঢ় হস্তলগ্নকে ধারণ করল।" (সূরা লুকমান: ২২)

অতএব ইসলাম এমন এক দীন, যা মানুষের আত্মাকে মুক্ত করে, হৃদয়ে তাকওয়ার চেতনা জাগায়, আর আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়।

◇ সারসংক্ষেপ

ইসলাম কোনো বিশেষ জাতি, বংশ বা জনগোষ্ঠীর ধর্ম নয়; এটি আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র চিরন্তন জীবনবিধান। সকল নবীর দাওয়াত ছিল ইসলামেরই দাওয়াত আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও আনুগত্যে আত্মসমর্পণ। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বর্ণ, জাতি বা ধন নয়; বরং তাকওয়া ও আমল। ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও মানবতার ধর্ম, যা মানুষের জীবনকে ভারসাম্যময় ও কল্যাণকর করে তোলে। প্রকৃত মুসলিম সেই, যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে রাখে।

১.৪ ইসলামে দাওয়াহর গুরুত্ব

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম নয়; বরং এটি এমন এক জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো দাওয়াহ অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। একজন মুসলিম যতদিন জীবিত, ততদিন তার দায়িত্ব থাকে আল্লাহর বার্তা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া; কারণ দাওয়াহর মাধ্যমেই দ্বীন টিকে থাকে, উম্মাহ জাগ্রত হয় এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে আমি তো মুসলমান—এর চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে?” (সূরা ফুসসিলাত: ৩৩)
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা দাওয়াতদাতাকে মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, যে মানুষ শুধু নিজের আমলে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যদেরও আল্লাহর পথে ডাকে তার অবস্থান আল্লাহর নিকটে সর্বোচ্চ।

- নবীদের দায়িত্ব ছিল দাওয়াহ:-

প্রতিটি নবীর মূল মিশনই ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“আমি নবীদের প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত না থাকে নবীদের আগমনের পর।” (সূরা নিসা: ১৬৫)

অতএব, দাওয়াহ নবীদের উত্তরাধিকার।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

“আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনে তা মনে রাখে এবং যেমন শুনেছে তেমনই পৌঁছে দেয়।”
(সুনান আবু দাউদ: ৩৬৬০; সহীহ তিরমিজি: ২৬৫৭)

এই হাদিসের মাধ্যমে নবী ﷺ আমাদের ওপর দাওয়াতি দায়িত্বের গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ, দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া শুধু আলেমদের নয়, বরং প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য।

- দাওয়াহর মাধ্যমে উম্মাহর মর্যাদা

উম্মতে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা দাওয়াহর দায়িত্ব বহন করে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত—যাদের মানবজাতির কল্যাণে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।” (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই আয়াত প্রমাণ করে একজন দায়ী ইলাল্লাহ কেবল সমাজের একজন সদস্য নয়; বরং সে আল্লাহর প্রতিনিধি, যিনি মানবতার কল্যাণে কাজ করেন। দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে সত্যের আলো ছড়ায়, অন্ধকার দূর হয় এবং ঈমানের চেতনা জাগে।

◇ দাওয়াহ: আমলের শ্রেষ্ঠ রূপ

দাওয়াহ এমন এক ইবাদত, যা ইলম, ইখলাস, ধৈর্য ও আখলাকের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। একজন দায়ী মানুষ কেবল কথা নয়; বরং তার জীবন, চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমেও দ্বীনের দাওয়াত দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

"যে কেউ কাউকে সৎকাজে আহ্বান করে, সে যেন নিজেই সে কাজটি করেছে।" (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩)

অতএব, একজন দায়ীর জন্য প্রতিটি দাওয়াতই সওয়াবের দ্বার।

যে মানুষ অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকে, সে শুধু নিজেকে নয় অসংখ্য মানুষকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসে, আর তাদের আমলের সওয়াবও তার আমলনামায় যুক্ত হয়।

◇ সারসংক্ষেপ

দাওয়াহ হলো ইসলামের প্রাণ; এর মাধ্যমেই সত্য টিকে থাকে।

নবীদের মূল দায়িত্ব ছিল দাওয়াহ; তাই এটি মুসলিম উম্মাহর উত্তরাধিকার। দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। যে দাওয়াহ দেয়, সে নবীদের উত্তরসূরি ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১.৫ দাওয়াহ ও দায়িত্বের সম্পর্ক:-

মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা শুধু একটি পুণ্যকাজ নয়; এটি এক দায়িত্ব যা প্রতিটি মুমিনের উপর অর্পিত হয়েছে। দাওয়াহ ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কিত দুইটি বিষয়, যেখানে একটির পূর্ণতা ছাড়া অপরটি অসম্পূর্ণ। কারণ, একজন মুসলিমের দায়িত্বই হলো আল্লাহর নির্দেশ প্রচার করা এবং মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই সফলকাম।"

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয় যে, দাওয়াহ কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয়; বরং এটি উম্মাহর অস্তিত্ব ও সফলতার অপরিহার্য দায়িত্ব।

- দাওয়াহ – ঈমানের প্রকাশ

একজন সত্যিকারের মুমিন তার ঈমানকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তা অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চায়। এই অনুভূতিই দাওয়াহর মূলভিত্তি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ
"তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা সে হাত দিয়ে পরিবর্তন করবে; যদি তাতে অক্ষম হয় তবে জিহ্বা দিয়ে; আর যদি তাও না পারে, তবে অন্তরে ঘৃণা করবে আর এটিই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"
(সহীহ মুসলিম: ৪৯)

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, দাওয়াহ কেবল বক্তৃতা নয়; বরং এটি হলো দায়িত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ সমাজে অন্যায় দেখলে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা করা।

- দায়িত্বের মূল উৎস আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
তিনি বলেনঃ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা স্থাপন করতে যাচ্ছি।"
(সূরা আল-বাকারা: ৩০)

অতএব, একজন দায়ী যখন মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে, তখন সে আসলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করছে।
এই দায়িত্ব অবহেলা করা মানে মানবতার প্রতি খিয়ানত করা, যা আল্লাহর নিকটে গুনাহের শামিল।

○ দাওয়াহ ও দায়িত্বের ভারসাম্য

দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করতে হলে চাই ইখলাস (আন্তরিকতা), ইলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম)।
যে ব্যক্তি শুধু জ্ঞান রাখে কিন্তু দাওয়াহ দেয় না, সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করছে না।
আর যে ব্যক্তি আহ্বান করে কিন্তু নিজে আমল করে না, সে তার দাওয়াহর প্রভাব হারিয়ে ফেলে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ
"তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের ভুলে যাও?"
(সূরা আল-বাকারা: ৪৪)
অতএব, দাওয়াহ ও দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক—
দাওয়াহ ছাড়া দায়িত্ব অপূর্ণ, আর দায়িত্ববোধ ছাড়া দাওয়াহ অর্থহীন।

○ সারসংক্ষেপ

দাওয়াহ কেবল আমল নয়; এটি প্রতিটি মুমিনের উপর অর্পিত এক ঈমানি দায়িত্ব। দাওয়াহ ও দায়িত্ব একই মূল থেকে উদ্ভূত—আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। একজন দায়ীকে হতে হবে জ্ঞানী, আন্তরিক ও কর্মে দৃষ্টান্ত। সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূর করার মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তি তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে।

■ অধ্যায় ২: ইসলামে দাওয়াতের সূচনা

২.১ নবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত ও সামাজিক দাওয়াহ পদ্ধতি

ইসলামের দাওয়াহর ইতিহাস শুরু হয়েছে নবী ﷺ-এর মাধ্যমে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ। তাঁর দাওয়াহর পদ্ধতি ছিল কোমল, ধৈর্যশীল, বাস্তববাদী ও আল্লাহভীতির আলোকে পরিচালিত। নবী ﷺ তাঁর জীবনযাত্রা, আচরণ, কথাবার্তা সব কিছু দিয়েই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন

○ ব্যক্তিগত দাওয়াহ – নীরব বিপ্লবের সূচনাঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর প্রথমে দাওয়াত শুরু করেন ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে, গোপনে ও ব্যক্তিগতভাবে।
আল্লাহ তাআলা প্রথমে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ <

"আর তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করো।"

(সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪)

এই নির্দেশনার পর নবী ﷺ প্রথমে তাঁর পরিবার ও নিকটজনদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি তাদের বুঝিয়েছেন আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং মানুষকে তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

এই পর্যায়ে নবী ﷺ যে দাওয়াহ পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা ছিল:

১. আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া।

২. গোপনে আহ্বান করা, যাতে মানুষ ভীত না হয়।

৩. নিজের চরিত্রের মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন করা।

হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রথমে নবী ﷺ-এর দাওয়াহ গ্রহণ করেন, এরপর হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ।

এভাবেই ব্যক্তিগত দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়েছে

- সামাজিক দাওয়াহ প্রকাশ্য আহ্বানের সূচনা

তিন বছর গোপনে দাওয়াহ দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে আদেশ দেনঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ <

"তোমাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং মুশরিকদের থেকে বিরত থাকো।"

(সূরা হিজর: ৯৪)

এর পর নবী ﷺ প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করেন

কাবা শরিফের পাশে, মক্কার বাজারে,

হজের মৌসুমে আগত কাফেলাগুলোর মাঝে। তিনি আহ্বান করতেন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا <

"হে মানুষ! বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলেই তোমরা সফল হবে।"

(ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ; সহীহ ইবনু হাব্বান: ৬২৫৮)

নবী ﷺ দাওয়াহে কঠোর ভাষা নয়, বরং হিকমাহ, ধৈর্য ও উত্তম আচরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ <

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল: ১২৫)

- দাওয়াহর ফলাফল ও নবীর ধৈর্য

নবী ﷺ অসংখ্য নির্যাতন ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও দাওয়াহর কাজ চালিয়ে গেছেন।
তাঁর এই ধৈর্য ও স্থিরতা আমাদের জন্য উদাহরণ।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ <

"আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন ধৈর্য ধরেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণ।"
(সূরা আহকাফ: ৩৫)
নবী ﷺ কখনও কারো প্রতি বিদ্বেষ বা প্রতিশোধের মনোভাব দেখাননি; বরং প্রতিটি কষ্টকে দাওয়াহর অগ্রগতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
তাই তাঁর দাওয়াহ ছিল একসাথে নরম, দৃঢ় ও আল্লাহনির্ভর।

- সারসংক্ষেপ

নবী ﷺ প্রথমে দাওয়াহ শুরু করেন ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে—গোপনে, ভালোবাসা ও চরিত্রের আলোকে। পরে আল্লাহর নির্দেশে তিনি দাওয়াহকে সমাজে প্রসারিত করেন—প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের মাধ্যমে। নবী ﷺ-এর দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য: আন্তরিকতা, হিকমাহ, ধৈর্য ও উত্তম আচরণ। তাঁর দাওয়াহ পদ্ধতি আজও প্রতিটি দায়ীর জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

২.২ ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াহ: পরিবার ও সমাজে আহ্বান

নবুওয়াতের সূর্য উদিত হওয়ার পর নবী মুহাম্মদ ﷺ প্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো তাঁর চারপাশের মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান করা। এটি কোনো হঠাৎ সিদ্ধান্ত ছিল না; বরং এক ধৈর্যশীল, পরিকল্পিত ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দাওয়াহর সূচনা।

- দাওয়াহর সূচনা পরিবার থেকে

প্রত্যেক সংস্কার শুরু হয় হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের জায়গা থেকে, আর নবী ﷺ-এর দাওয়াহও তেমনভাবেই শুরু হয় নিজের পরিবার দিয়ে।

যখন হেরা গুহায় প্রথম ওহি নাযিল হলো "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" তখন নবী ﷺ ভীত ও বিমূঢ় হয়ে যান। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রাঃ)। তিনি নবী ﷺ-কে সাহস, আশ্বাস ও দৃঢ় বিশ্বাসের বাণী দেন। তিনি প্রথম নারী হিসেবে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন।

এরপর ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন

হযরত আলী (রাঃ), হযরত জায়েদ ইবন হারিসা (রাঃ),

হযরত আবু বকর (রাঃ)। এই প্রথম কয়েকজন মানুষই ইসলামের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নবী ﷺ তাঁদেরকে শুধু ধর্মীয় আদেশ দেননি, বরং ভালোবাসা, সম্মান ও যুক্তির আলোকে বুঝিয়েছেন জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

এভাবেই দাওয়াহর প্রথম ধাপ ছিল পারিবারিক ও আন্তরিক যেখানে ভাষা ছিল মৃদু, আচরণ ছিল নম্র, আর উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার।

○ পারিবারিক পরিসর থেকে সামাজিক ক্ষেত্র:-

যখন কয়েকজন বিশ্বাসী তৈরি হয়ে গেলেন, নবী ﷺ শুরু করলেন সমাজের বৃহত্তর স্তরে দাওয়াহ। তাঁর দাওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াহ।"

তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা মানুষকে ভাবতে বাধ্য করত "যে কখনও মিথ্যা বলে না, সে কিভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলবে?" মক্কার মানুষ নবী ﷺ-কে চিনত আল-আমিন (বিশ্বস্ত) নামে। তাই যখন তিনি আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করলেন, তখন অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তাঁকে উপহাস করতে পারল না।

তাঁর দাওয়াহর মূল পদ্ধতিগুলো ছিল

১. ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করা।

২. প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বার্তা দেওয়া।

৩. ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে উপদেশ দেওয়া।

৪. কোনো প্রতিদান আশা না করা।

তিনি কখনও কারো প্রতি কঠোর হননি; বরং যারা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতিও দোয়া করেছেন।

যেমন, তায়েফের ঘটনার সময় তিনি কষ্ট পেয়েও বলেছিলেন

"হে আল্লাহ! এরা জানে না, তাই ক্ষমা করুন।"

এই মনোভাবই ছিল তাঁর দাওয়াহর মূল চেতনা

মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং তাদের হৃদয়ে আলোর সঞ্চার করা।

◇ মক্কার সমাজে দাওয়াহর চ্যালেঞ্জ

মক্কার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কুসংস্কার, মূর্তিপূজা ও গৌরব-অহংকারে নিমজ্জিত ছিল।
তারা নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মকে "গৌরব" মনে করত।
এই সমাজে একজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে যখন ঘোষণা করলেন "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"
তখন তা ছিল এক মানসিক বিপ্লবের সূচনা।
নবী ﷺ জানতেন, পরিবর্তন কখনও সহজ নয়।
তাই তিনি দাওয়াহর প্রতিটি ধাপে নরম ভাষা, যুক্তিসঙ্গত উপদেশ ও উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।
তাঁর সহচরগণও তাঁর মতোই ধৈর্য ধারণ করে, নির্যাতন সহ্য করে ইসলাম প্রচার করেছেন। যেমন,
বিলাল (রাঃ)-এর ধৈর্য, আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ)-এর সহনশীলতা, সুমাইয়া (রাঃ)-এর শাহাদাত সবই প্রমাণ করে যে দাওয়াহর শুরু ছিল ত্যাগ ও ধৈর্যের ভিত্তিতে গড়া।

◇ নবী ﷺ-এর দাওয়াহর প্রভাব

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নবী ﷺ-এর দাওয়াহ মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।
মানুষ তাঁর চরিত্র দেখে ইসলাম গ্রহণ করত, তাঁর কথায় শান্তি পেত। দাওয়াহর এই প্রাথমিক পর্বই পরবর্তীতে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের মূলভিত্তি তৈরি করে।
তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখি পরিবর্তনের জন্য দরকার ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও কোমল আচরণ। পরিবারই দাওয়াহর প্রথম কেন্দ্র। সমাজে প্রভাব ফেলতে হলে আগে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করতে হয়।

◇ সারসংক্ষেপ

নবী ﷺ দাওয়াহর কাজ শুরু করেন ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে — ভালোবাসা, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে। তিনি দাওয়াহর সময় কখনও রাগ বা জোর প্রয়োগ করেননি; বরং চরিত্র ও উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। পরিবার ও সমাজ উভয় স্তরেই তিনি আল্লাহর একত্ব, ন্যায় ও মানবতার বার্তা প্রচার করেছেন। তাঁর দাওয়াহর এই প্রাথমিক ধাপগুলোই আজও দুনিয়ার প্রতিটি দায়ীর জন্য পথনির্দেশক আদর্শ।

২.৩ সাহাবায়ে কেরামের সক্রিয় দাওয়াহ ও জীবন থেকে শিক্ষণীয় উদাহরণ

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর দাওয়াহের প্রভাব যে হৃদয়ে সবচেয়ে গভীরভাবে ছুঁয়েছিল, তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁরা ছিলেন দাওয়াহর বাস্তব রূপ যাঁরা শুধু শোনা বা বলা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিক দিয়ে দাওয়াহকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নবী ﷺ তাঁদেরকে কেবল ইসলাম শেখাননি; বরং কিভাবে ইসলাম প্রচার করতে হয়, তাও শিখিয়েছিলেন। ফলে সাহাবীগণ আল্লাহর পথে এমন আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, যা আজও প্রতিটি দায়ীর জন্য অনুপ্রেরণা।

- দাওয়াহর প্রতি সাহাবীদের আন্তরিকতা

সাহাবীগণ দাওয়াহকে কখনও কেবল দায়িত্ব হিসেবে নেননি; তাঁরা এটিকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি ঈমান গ্রহণের পর অন্যকে দাওয়াত দেননি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরপরই তাঁর বন্ধুদের আহ্বান করেছিলেন।।তাঁর দাওয়াহর ফলেই ইসলাম গ্রহণ করেন বহু বিশিষ্ট সাহাবি যেমন, উসমান ইবনু আফফান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ), তালহা (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) প্রমুখ।তিনি ছিলেন এমন একজন দায়ী, যিনি নরম ভাষা, দয়ার মনোভাব ও দৃঢ় ঈমান দিয়ে হৃদয় জয় করতেন। হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের আগে ছিলেন দাওয়াহর বিরোধী, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর হয়ে যান এর রক্ষক ও প্রচারক।

তিনি প্রকাশ্যে নামাজ আদায় ও ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন।

তাঁর দৃঢ়তা প্রমাণ করে দাওয়াহ কখনও ভয় বা গোপনতার কাজ নয়; বরং সাহস ও বিশ্বাসের প্রকাশ।

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাঃ) নবী ﷺ-এর নির্দেশে ইয়ামান অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তিনি মানুষকে আহ্বান করতেন প্রজ্ঞা, যুক্তি ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে।

নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন—

"তুমি সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, ভীত করো না।"

(সহীহ বুখারী, হাদিস ৩০৩৮)

এই দিকনির্দেশনাই ছিল সাহাবাদের দাওয়াহর ভিত্তি কোমলতা ও হিকমাহ।

- দাওয়াহর ত্যাগ ও সহনশীলতা

সাহাবীগণ দাওয়াহর পথে অকল্পনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু পিছিয়ে যাননি।

বিলাল (রাঃ)-কে গরম বালুর ওপর ফেলে নির্যাতন করা হতো, কিন্তু তাঁর জবাব ছিল একটাই "আহাদ, আহাদ" (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ)।
আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) ও তাঁর পরিবারও একইভাবে নির্যাতিত হন, তবুও তাঁরা দাওয়াহর বার্তা ত্যাগ করেননি।
এই দৃঢ়তা প্রমাণ করে দাওয়াহ কেবল মুখের আহ্বান নয়, বরং ত্যাগ ও ধৈর্যের সমন্বয়।

- সাহাবীদের দাওয়াহর ফলাফল

মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ইসলাম মক্কার সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ইয়ামান, হাবাশা, মিশর, পারস্য, সিরিয়া ও রোম পর্যন্ত। কোনো মিডিয়া, কোনো প্রযুক্তি ছিল না; কিন্তু ছিল জীবন্ত দাওয়াহ, সত্যিকারের চরিত্র আর অকৃত্রিম ঈমান। তাঁদের দাওয়াহ মানুষকে কেবল ধর্মে নয়, ন্যায়ের, করুণা ও মানবতার পথে আহ্বান করেছিল।
এই দাওয়াহর সাফল্য ছিল আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়ন

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহর সাহায্য করো (তাঁর দীন প্রচার করে), তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।"(সূরা মুহাম্মদ: ৭)

- শিক্ষণীয় বার্তা

সাহাবীদের জীবন আমাদের শেখায় দাওয়াহর মূল শক্তি হলো ঈমান ও আমল। মানুষের হৃদয় জয় করা যায় চরিত্র ও ধৈর্যের মাধ্যমে, জোর বা তর্কে নয়। দাওয়াহর জন্য প্রয়োজন ত্যাগ, সময় ও আন্তরিকতা। একজন দায়ী যদি নিজে দ্বীনের আদর্শ হয়, তবে তার প্রতিটি কাজই দাওয়াহ হয়ে ওঠে।

- সারসংক্ষেপ

সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াহকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তাঁরা নরম ভাষা, উত্তম আচরণ ও ত্যাগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁদের ধৈর্য, সাহস ও ঈমান দাওয়াহর প্রকৃত আদর্শ স্থাপন করেছে। আজও তাঁদের দাওয়াহর উত্তরাধিকার বহন করছে মুসলিম উম্মাহ দায়িত্ব ও আমানের বার্তা নিয়ে।

২.৪ তাবেঈন ও তাবে তাবেয়িনদের দাওয়াহ: যুগোপযোগী শিক্ষা

নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দাওয়াহর যে আলো প্রজ্বলিত করে গিয়েছিলেন, তা নিভে যায়নি তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মেও। বরং তাবেঈন ও তাবে তাবেয়িনগণ সেই আলোকশিখাকে আরও বিস্তৃত করেছেন জ্ঞান, আমল, চরিত্র ও দাওয়াহর সমন্বয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ইসলামের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।
তাঁদের যুগ ছিল এমন এক সময়, যখন ইসলাম দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছিল নতুন নতুন দেশে, সংস্কৃতি ও ভাষায়। ফলে দাওয়াহ তখন শুধু মুখের আহ্বান নয়; বরং হয়ে ওঠে জ্ঞানচর্চা, আদব, আচরণ ও সমাজ গঠনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া।

- তাবেঈনদের দাওয়াহর পদ্ধতি

তাবেঈনরা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সরাসরি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের থেকে শিখেছিলেন হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও খালিস নিয়্যাত যা ছিল তাদের দাওয়াহর প্রাণ। হাসান আল-বাসরী (রহ.), তাবেঈনদের একজন শ্রেষ্ঠ দাঈ, মানুষকে আহ্বান করতেন ভয় নয়, বরং ভালোবাসার মাধ্যমে। তাঁর ভাষণ মানুষকে কাঁদাতো, কারণ তাঁর আমল ও আচরণ তাঁর কথার সাক্ষ্য দিত। তিনি বলেছিলেন,
“দাওয়াহ হলো এমন আয়না, যেখানে মানুষ তোমার কথার চেয়ে তোমার কাজ বেশি দেখে।”

ইকরিমা (রহ.), আতা ইবনু আবি রাবাহ (রহ.), মুজাহিদ (রহ.) এঁরা ছিলেন জ্ঞানের মাধ্যমে দাওয়াহ প্রচারকারীগণ। তাঁরা কুরআনের তাফসির ও হাদিস ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ও মননকে আল্লাহমুখী করে তুলেছিলেন। তাবেঈনদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল — তাঁরা দাওয়াহকে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার এর অংশ হিসেবে দেখতেন। মসজিদ ছিল তাদের কেন্দ্র, কিন্তু তাদের প্রভাব পৌঁছাত ব্যবসা, রাজনীতি ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি স্তরে।

- তাবে তাবেয়িনদের অবদান

তাবে তাবেয়িনদের যুগে ইসলাম নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে যেমন খোরাসান, আন্দালুস, সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি। এই সময়ের দাঈগণ কেবল বক্তা ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদও। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ.) এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দাওয়াতের ধারক ও বাহক। তাঁরা ইসলামী ফিকহ ও হাদিসকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সহজেই ইসলামের দাওয়াহ সঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারে।

তাবে তাবেয়িনদের দাওয়াহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহ।।তাঁরা শুধু মানুষকে নামাজে আহ্বান করেননি; বরং যুক্তি, প্রমাণ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে অমুসলিম সমাজের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন।
তাদের এই পদ্ধতিই ইসলামকে একটি চিন্তার সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

◇ তাদের দাওয়াহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১. জ্ঞান ও চরিত্রের সমন্বয়:
তাবেঈন ও তাবে তাবেয়িনরা শিখিয়েছেন, জ্ঞান ছাড়া দাওয়াহ অন্ধ, আর চরিত্র ছাড়া জ্ঞান নিষ্প্রভ।
২. হিকমাহ ও সহনশীলতা:
তাঁরা কখনও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না; বরং সময়, স্থান ও শ্রোতার মানসিকতা অনুযায়ী দাওয়াহ দিতেন।
৩. সমাজে প্রভাব বিস্তার:
তাদের দাওয়াহ শুধু ধর্মীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলেছিল।
৪. দাওয়াহর উত্তরাধিকার:
তাঁরা দাওয়াহর কাজকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকে।

◇ যুগোপযোগী শিক্ষা

আজকের দায়ীদের জন্য তাবেঈন ও তাবে তাবেয়িনদের দাওয়াহ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
তাঁরা শেখান দাওয়াহ শুধুমাত্র মুখের আহ্বান নয়; বরং এটি চরিত্র, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে; কারণ মানুষ প্রথমে দেখে দায়ী কেমন, তার কথা পরে শোনে। দাওয়াহর জন্য প্রয়োজন সহিষ্ণুতা, নরম ব্যবহার ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা।

২.৫ দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্ব

প্রিয় পাঠক,

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের হৃদয়, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র—সবকিছুর সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

দাওয়াহ হলো সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে সমাজের অন্ধকারে আলো ছড়ানো যায়, অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়, এবং মানবতার ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যায়।

- সমাজ পরিবর্তনের সূচনা দাওয়াহ দিয়ে

সমাজে পরিবর্তন কখনোই আকস্মিকভাবে আসে না; তা আসে মানুষে মানুষে চিন্তা, নৈতিকতা ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে। আর এই পরিবর্তনের সূচনা হয় দাওয়াহর মাধ্যমে — মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনা, এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভেতরকার অবস্থা পরিবর্তন করে।”

— (সূরা আর-রা‘দ: **১১**)

এই আয়াতের বার্তা হলো — দাওয়াহ মানুষকে আত্মপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করে।

যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহভীতি অর্জন করে, অন্যায় ত্যাগ করে, তখনই সমাজে সত্যিকার পরিবর্তন শুরু হয়।

- রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহর মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াহর আগে আরব সমাজ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন — হত্যা, মূর্তিপূজা, নারীর অবমাননা ও অন্যায়ের রাজত্ব। কিন্তু মাত্র তেইশ বছরের দাওয়াহর মাধ্যমে সেই সমাজ পরিবর্তিত হয় ন্যায়, দয়া, মানবতা ও আল্লাহভীতির সমাজে। রাসূল ﷺ মানুষের হৃদয় বদলেছেন আদর্শ চরিত্র, ধৈর্য ও দাওয়াহর প্রজ্ঞা দিয়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”
— (সূরা আন-নাহল: ১২৫)

রাসূল ﷺ কখনো কঠোরতা দেখাননি; বরং ভালোবাসা ও সহনশীলতার মাধ্যমে পরিবর্তনের বীজ বপন করেছেন।
তাঁর এই দাওয়াহর ফলেই জাহিলিয়াতের সমাজ পরিণত হয় মানবতার সমাজে।

○ দাওয়াহর প্রভাব: নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

একটি সমাজ তখনই সৎ পথে ফিরে আসে, যখন তার মানুষগুলো সৎ হয়।
দাওয়াহ সেই নৈতিক জাগরণ ঘটায়, যা মানুষের মন ও চিন্তাকে আল্লাহমুখী করে তোলে।
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“যে ব্যক্তি কাউকে কোনো কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তার জন্য সেই কল্যাণকাজের কর্মীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে।”
— (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩)

অর্থাৎ, একজন দায়ী শুধু একজন মানুষকে বদলায় না — সে বদলায় পুরো সমাজের গতিপথ। কারণ, একজন সৎ মানুষ শত অসৎ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তার চরিত্র ও দাওয়াহর মাধ্যমে।

○ সমাজ পরিবর্তনে দায়ীর ভূমিকা

১. নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা:
দায়ী নিজের আচরণে যা প্রচার করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।মানুষ কথা নয়, কাজ দেখে বদলায়।
২. সহনশীলতা ও দয়া প্রদর্শন:
সমাজের অজ্ঞ ও বিপথগামীদের প্রতি ঘৃণা নয়, বরং সহানুভূতি ও মমতা প্রদর্শন দাওয়াহর প্রকৃত রূপ।
৩. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:
দাওয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জ্ঞানের প্রসার — কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানুষকে সঠিক জ্ঞান দেওয়া।
৪. দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য শেখানো:

দায়ী মানুষকে শুধু দুনিয়া থেকে দূরে টানে না; বরং শেখায় কিভাবে দুনিয়াকে আখিরাতের প্রস্তুতির জায়গা বানানো যায়।

◇ সমসাময়িক শিক্ষা

বর্তমান যুগে দাওয়াহ সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর পথ হতে পারে—
যদি তা হয় প্রজ্ঞা, ধৈর্য, ও বাস্তবতা বোঝার ভিত্তিতে।
একজন দায়ীকে বুঝতে হবে, আজকের সমাজের মানুষ যুক্তি ও ভালোবাসা বোঝে, তাই দাওয়াহর ভাষাও হতে হবে হৃদয়স্পর্শী ও ইতিবাচক।

◇ সারসংক্ষেপ

দাওয়াহ সমাজে নৈতিক ও আত্মিক পরিবর্তনের সূচনা করে। সমাজের প্রতিটি উন্নয়ন শুরু হয় একজন দায়ীর চিন্তা ও ত্যাগ থেকে। দাওয়াহ কেবল কথা নয়, বরং আদর্শ জীবনযাপনই এর মূল পদ্ধতি। দাওয়াহর মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে ঈমান, ন্যায় ও কল্যাণের আলো।

■ অধ্যায় ৩: একজন দায়ী ব্যক্তির গুণাবলি

৩.১ সততা, ধৈর্য ও নম্রতা

একজন দায়ী ইলাল্লাহ-এর চরিত্রই তার দাওয়াহর মূল ভিত্তি। কথা নয়—মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় দায়ীর আচরণ, ধৈর্য ও সততা দেখে। দাওয়াহর সফলতা নির্ভর করে দায়ীর আন্তরিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তার উপর।

◇ সততা

দায়ীকে হতে হবে সত্যবাদী ও আমানতদার।
কারণ, মিথ্যা কথা দাওয়াহর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ
“তোমরা সত্যবাদী হও; কারণ সত্য নেক কাজের দিকে পরিচালিত করে।”
— (সহীহ বুখারী: ৬০৯৪, সহীহ মুসলিম: ২৬০৭)

দায়ী যদি নিজের কথায় ও কাজে সঙ্গতি রাখে, তবে তার দাওয়াহ মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

◇ ধৈর্য

দাওয়াহর পথে পরীক্ষা অনিবার্য। অবমাননা, প্রতিরোধ বা কষ্টের মধ্যেও একজন দায়ী ধৈর্য হারান না; বরং আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“অতএব ধৈর্য ধরো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।”
— (সূরা রূম: ৬০)

রাসূল ﷺ নিজ জীবনে সীমাহীন ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—তাই দায়ীর জন্য ধৈর্য সফলতার চাবিকাঠি।

◇ নম্রতা

নম্রতা দাওয়াহর প্রাণ। দায়ী যদি অহংকারে আক্রান্ত হয়, তার দাওয়াহ হৃদয় স্পর্শ করে না।
আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে বলেছেনঃ

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“আপনি যদি কঠোর ও রূঢ় হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।”
— (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

অতএব, একজন দায়ীকে সর্বদা নরম ভাষা, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও বিনয়ী আচরণ বজায় রাখতে হবে।

◇ সারসংক্ষেপ

সততা দাওয়াহকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ধৈর্য দায়ীকে দৃঢ় রাখে বিপদের সময়েও। নম্রতা মানুষকে আকৃষ্ট করে ও দাওয়াহর বার্তাকে হৃদয়ে স্থাপন করে।

৩.২ সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার

একজন দায়ী ইলাল্লাহ জানেন—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও সম্পদ আল্লাহর অর্পিত আমানত।দাওয়াহর কাজে সফল হতে হলে এই দুইটি নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ, সময় ও সম্পদ নষ্ট করা মানে সুযোগ হারানো, দায়িত্ব অপূর্ণ রাখা।

○ সময় — দায়ীর মূল পুঁজি

সময় এমন এক সম্পদ, যা একবার হারালে কখনো ফেরে না। আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সময়ের উপরঃ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"

— (সূরা আল-আসর: ১–২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সময় অপচয় করা মানেই ক্ষতি—দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের। একজন দায়ীকে তাই সময় ব্যবস্থাপনায় সচেতন হতে হবে— নামাজ, শিক্ষা, দাওয়াহ, পরিবার—সব ক্ষেত্রেই ভারসাম্য রক্ষা করা তার দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ

"কিয়ামতের দিনে বান্দার পা সরবে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে— তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে।"

— (সহীহ তিরমিজি: ২৪১৭)

অতএব, সময় হলো দায়ীর কাছে এক আমানত, যার হিসাব একদিন দিতে হবে আল্লাহর সামনে।

○ সম্পদ — দাওয়াহর হাতিয়ার

সম্পদও এক প্রকার পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"তোমরা ব্যয় করো, যা তোমাদেরকে (অস্থায়ীভাবে) দায়িত্বপ্রাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।"

— (সূরা হাদীদ: ৭)

দায়ীকে বুঝতে হবে—অর্থ কেবল নিজের বিলাসের জন্য নয়; বরং দাওয়াহ, শিক্ষা, দরিদ্র সহায়তা ও মানবকল্যাণে ব্যবহার করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কারণ, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তা কখনো ক্ষতি হয় না, বরং বহুগুণে ফেরত আসে।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

"যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে।"

— (সূরা আল-বাকারা: ২৬১)

○ দায়িত্বশীল ব্যবহারের ফল

যে দায়ী সময় ও সম্পদের মূল্য বোঝে, সে-ই নিজের জীবনকে সাজাতে পারে দাওয়াহর কাফেলায় কার্যকর সদস্য হিসেবে। তাকে দিয়ে সমাজ, শিক্ষা ও দাওয়াহর সব ক্ষেত্রেই কল্যাণ ঘটে।

○ সারসংক্ষেপ

সময় হলো দায়ীর সর্বোচ্চ সম্পদ—এটি অপচয় মানে সুযোগ হারানো। সম্পদ হলো দাওয়াহর শক্তি—যা আল্লাহর পথে ব্যয় করলে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারই দায়ীর দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

৩.৩ জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজ আলোকিত করা

প্রিয় পাঠক,

একজন দায়ীর জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ইলম (জ্ঞান) এবং আখলাক (নৈতিকতা)। জ্ঞান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, আর নৈতিকতা তাকে মানুষের হৃদয়ে স্থান দেয়। এই দুই গুণের সমন্বয় ছাড়া দাওয়াহ কখনো ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, আল্লাহ তাআলা দীন প্রচারের জন্য শুধু মুখ নয় — জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণ চেয়েছেন।

○ জ্ঞানের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে উচ্চ স্থানে।

তিনি বলেনঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?" — (সূরা যুমার: ৯)

অর্থাৎ, অজ্ঞতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে। একজন দায়ী যদি জ্ঞানসম্পন্ন না হন, তবে তার দাওয়াহ অন্ধের মতো হবে — দিকহীন ও দুর্বল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"যার সঙ্গে আল্লাহ মঙ্গল করতে চান, তাকে তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

— (সহীহ বুখারী: ৭১, সহীহ মুসলিম: ১০৩৭)

অতএব, দায়ীর জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা শুধু প্রয়োজন নয়, বরং ফরজে আইন (ব্যক্তিগত দায়িত্ব)।

কারণ, সে যদি সঠিক না জানে, তাহলে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার ঝুঁকি থাকে।

○ জ্ঞানের আলো সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া

দায়ী কেবল জ্ঞান অর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সে জ্ঞানের আলো সমাজে ছড়িয়ে দেয়।
তার প্রতিটি দাওয়াহ, পরামর্শ ও আচরণ মানুষকে শিক্ষা দেয় আল্লাহভীতি, ন্যায় ও মানবতার পাঠ।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকাজ করে — তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে?" — (সূরা ফুসসিলাত: ৩৩)

এই আয়াতে দাওয়াহ ও আমলের সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে।একজন দায়ী যদি শুধু কথা বলে কিন্তু আমল না করে, তাহলে তার দাওয়াহর প্রভাব হারিয়ে যায়।
তাই জ্ঞান ও নৈতিকতা একত্রে সমাজ পরিবর্তনের মূল উপাদান।

○ নৈতিকতা — দায়ীর প্রভাবের প্রাণ

জ্ঞান যদি মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে, তবে নৈতিকতা হৃদয় জয় করে।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে।"
— (সহীহ বুখারী, আল-আদবুল মুফরাদ: ২৭৩, সহীহ হাদিস)
অর্থাৎ, রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহর মূল ভিত্তিই ছিল নৈতিকতা।যেখানে জ্ঞান আছে কিন্তু আখলাক নেই, সেখানে দাওয়াহ কঠোর হয়ে যায়; আর যেখানে আখলাক আছে কিন্তু জ্ঞান নেই, সেখানে দাওয়াহ দুর্বল হয়।
একজন দায়ীকে তাই শিখতে হবে কিভাবে নরম ভাষা, সহনশীল মনোভাব ও ন্যায়ের চেতনায় মানুষকে আহ্বান করতে হয়।
আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"তোমরা তার (ফিরআউনের) সাথে কোমলভাবে কথা বলো; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।"
— (সূরা ত্বা-হা: ৪৪)

এখান থেকে বোঝা যায় — দাওয়াহর কার্যকারিতা কণ্ঠের জোরে নয়, বরং কথার কোমলতায়।

○ জ্ঞান ও আখলাকের সমন্বয় সমাজে প্রভাব ফেলে

যখন দায়ী জ্ঞান অর্জন করে, তা আমলে রূপ দেয়, এবং আখলাক দিয়ে উপস্থাপন করে — তখন সমাজে আলো ছড়ায়। একজন দায়ীর ভালো আচরণ, ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা ও বিনয়ী ব্যবহার মানুষকে দীনমুখী করে।
ইসলাম ঠিক এভাবেই ছড়িয়েছে — জ্ঞানের আলো ও নৈতিকতার সৌন্দর্যে।

○ সারসংক্ষেপ

জ্ঞান দায়ীকে পথ দেখায়, আখলাক তাকে মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করে। যে দাওয়াহ জ্ঞাননির্ভর নয়, তা অন্ধ; আর যে দাওয়াহ আখলাকবিহীন, তা নিস্তেজ। আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্য চাই গভীর জ্ঞান, বিনয়, প্রজ্ঞা ও উত্তম চরিত্র। জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ই দাওয়াহর সফলতার মূল চাবিকাঠি।

৩.৪ দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিচয়

দাওয়াহ কেবল মানুষকে আহ্বান করার নাম নয়, বরং এটি এক নেতৃত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
একজন দায়ী আল্লাহর পথে আহ্বান করে, অন্যদের নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজে আদর্শ স্থাপন করে
অতএব, তার প্রতিটি আচরণে থাকা উচিত দায়িত্ববোধ, ন্যায়, সহানুভূতি ও দৃঢ়তা। নেতৃত্ব মানে কেবল পদ নয়; বরং নিজের আমল ও আচরণের মাধ্যমে পথ দেখানো।
এ কারণেই ইসলাম নেতৃত্বকে আমানত হিসেবে দেখেছে, গৌরব হিসেবে নয়।

○ দাওয়াহ ও নেতৃত্ব — একে অপরের পরিপূরক

একজন দায়ী আসলে সমাজের নেতা। যিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেন, অন্যায় থেকে বিরত রাখেন এবং উদাহরণ স্থাপন করেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে এমন নেতা সৃষ্টি করেছি, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত—
কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আমার আয়াতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।” (সূরা আস-সাজদাহ: ২৪)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়—নেতৃত্ব আসে ধৈর্য, ঈমান ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে।

একজন দায়ী যখন তার জীবনে এই গুণাবলি ধারণ করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের কাছে নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে।

◇ দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মানে

দায়িত্বপূর্ণ আচরণ মানে হলো নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, অন্যদের অধিকার রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচারে অটল থাকা।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"

— (সহীহ বুখারী: ৮৯৩, সহীহ মুসলিম: ১৮২৯)

অর্থাৎ, দায়িত্বশীলতা শুধু শাসকের নয়—প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। একজন দায়ী যদি দায়িত্বজ্ঞান হারায়, তার দাওয়াহ দুর্বল হয়, আর তার নেতৃত্বের মর্যাদা কমে যায়।

◇ নেতৃত্বে ন্যায় ও বিনয়

আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের আদেশ দেন।" (সূরা আন-নাহল: ৯০)

ন্যায় ও বিনয়—এই দুটি গুণ নেতৃত্বের ভিত্তি। রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী নেতা।

তিনি কখনো নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না, বরং বলতেনঃ

إِنَّمَا أَنَا خَادِمٌ —

"আমি তো কেবল একজন খিদমতগার (সেবক)।"

একজন দায়ী যদি এই নীতি মেনে চলে—

অর্থাৎ দায়িত্ব পালন করে বিনয়ের সাথে, তাহলে তার দাওয়াহ মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে।

◇ বাস্তব উদাহরণ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নেতৃত্বে যেমন দৃঢ় ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী ও দায়িত্বশীল।

তিনি রাতে ছদ্মবেশে ঘুরতেন মানুষের খোঁজে—কেউ অভুক্ত আছে কি না তা দেখার জন্য। এই উদাহরণ দায়ীদের শেখায়—নেতৃত্ব মানে সেবা, গৌরব নয়।

◇ সারসংক্ষেপ

দায়ী আসলে সমাজের নেতা—যিনি আমল ও নৈতিকতার মাধ্যমে দাওয়াহকে বাস্তবে প্রমাণ করেন।
দায়িত্বপূর্ণ আচরণই একজন দায়ীর প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়। নেতৃত্বে চাই ন্যায়, ধৈর্য, বিনয় ও আল্লাহভীতি।
দাওয়াহর সফলতা নির্ভর করে দায়ীর আচরণ ও দায়িত্ববোধের উপর।

■ অধ্যায় ৪: পরিবারে দায়িত্ব

৪.১ পিতামাতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও আদর্শ আচরণ

প্রিয় পাঠক, পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি।
যদি পরিবার সঠিক পথে পরিচালিত হয়, সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়; আর যদি পরিবার ভেঙে পড়ে, সমাজও অস্থির হয়ে পড়ে। তাই ইসলামে পরিবারে দায়িত্ব ও আদর্শ আচরণের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন দায়ী ইলাল্লাহ প্রথমত নিজের পরিবার থেকেই দাওয়াহ শুরু করবে যেমনটা করেছিলেন নবীগণ ও সাহাবায়ে কেরাম।

- পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহুবার পিতামাতার অধিকারের কথা স্মরণ করিয়েছেন।
তিনি বলেনঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন তোমরা তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতামাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"
(সূরা ইসরা: ২৩)
এই আয়াতে ইবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রমাণ করে তাদের অধিকার কতটা মহান। একজন দায়ী যদি নিজের পিতামাতার প্রতি অবহেলা করে, তাহলে তার দাওয়াহের কোনো মূল্য থাকে না।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

"আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত পিতামাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।"
(সুনান তিরমিজি: ১৮৯৯, সহীহ হাদিস)

অতএব, দাওয়াহর প্রকৃত শুরু হয় ঘর থেকেই —
যখন সন্তান পিতামাতার প্রতি আনুগত্য, দয়া ও ভালোবাসার আচরণ প্রদর্শন করে।

◇ সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানরা পিতামাতার কাছে আমানত।
তাদের শিক্ষা, আদব, ঈমান ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পিতামাতার উপর অর্পিত।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে।"
— (সূরা তাহরিম: ৬)
এই আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে —
পরিবারকে দাওয়াহ, শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نِحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভালো কিছু দান করতে পারে না।"
— (সুনান তিরমিজি: ১৯৫২, সহীহ হাদিস)
অতএব, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া, নামাজের অভ্যাস করানো,এবং নৈতিকভাবে দৃঢ় করে তোলা
এগুলোই একজন পিতামাতার সর্বোচ্চ দাওয়াহর কাজ।

◇ আদর্শ আচরণের শিক্ষা

নবী মুহাম্মদ ﷺ পরিবারে ভালো আচরণের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন।
তিনি বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি,যে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম আচরণ করে। আর আমি তোমাদের মধ্যে পরিবারের জন্য সর্বোত্তম।" (সহীহ ইবনু মাজাহ: ১৯৭৭)
এই হাদিস দায়ীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা দাওয়াহর শুরু হয় নিজের ঘর থেকে, নিজের আচরণ, কথাবার্তা ও সহানুভূতির মধ্য দিয়ে।

◇ সারসংক্ষেপ

পরিবার সমাজের ভিত্তি, তাই দায়ীর দাওয়াহর প্রথম ক্ষেত্র তার নিজ পরিবার। পিতামাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ খুলে দেয়।সন্তানদের ইসলামীভাবে গড়ে তোলা দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি।

পরিবারের প্রতি আদর্শ আচরণই দায়ীর দাওয়াহর প্রথম সোপান।

৪.২ স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া

পরিবারের শান্তি ও স্থিতিশীলতার মূল হলো স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া। ইসলাম দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ককে কেবল দুনিয়ার সম্পর্ক হিসেবে নয়,
বরং একে করেছে ইবাদত ও আমানত যেখানে ভালোবাসা, দয়া ও দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো—
তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও;
এবং তিনি তোমাদের মধ্যে রেখেছেন ভালোবাসা ও দয়া।"
(সূরা আর-রূম: ২১)
এই আয়াত প্রমাণ করে—দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি (সাকীনাহ), ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) ও দয়া (রাহমাহ)। অতএব, এই সম্পর্ক তখনই সফল হয়, যখন উভয়ে দায়িত্বশীল ও পরস্পরের অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকে।

- স্বামীর দায়িত্ব

স্বামী পরিবারের নেতা ও রক্ষক। তার দায়িত্ব হলো ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্ব প্রদান করা—কঠোরতা নয়, বরং ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ দিয়ে পরিবার পরিচালনা করা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদেরকে একে অপরের উপর কিছু গুণে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন
এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি,যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে।" (সহীহ তিরমিজি: ৩৮৯৫)

অতএব, স্বামীর নেতৃত্ব মানে পরিবারের সেবা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

◇ স্ত্রীর দায়িত্ব:-

ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে "পরিবারের হৃদয়" হিসেবে।

স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামী ও সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"যে নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে,নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে,তাকে বলা হবে: জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, প্রবেশ করো।" (মুসনাদ আহমাদ: ১৬৬৪, সহীহ হাদিস)

এ হাদিস প্রমাণ করে—স্ত্রীর আনুগত্য ও দায়িত্বশীলতা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম।

◇ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দাওয়াহ

স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল পারিবারিক নয়, বরং এটি দাওয়াহর ভিত্তি যেখানে উভয়ে একে অপরকে আল্লাহর পথে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—তারা একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজে আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আত-তাওবা: ৭১)

এই আয়াত বলে দেয়—একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবন হলো এমন, যেখানে উভয়ে একে অপরের দীনদার সহযাত্রী।

◇ ইসলামী আদর্শে সহযোগিতা

দাম্পত্য সম্পর্কে যদি দায়িত্ববোধ, নম্রতা ও মাফ করার মনোভাব থাকে, তবে পরিবারে শান্তি স্থায়ী হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে;
কারণ যদি তার কোনো একটি স্বভাব অপছন্দ হয়,
তবে নিশ্চয় অন্য কোনো গুণ তার পছন্দনীয় হবে।"

— (সহীহ মুসলিম: ১৪৬৯)
এ শিক্ষাই দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য—
সহনশীলতা, ক্ষমা ও ইতিবাচক চিন্তা।

- সারসংক্ষেপ

দাম্পত্য সম্পর্ক ইবাদতের মতোই পবিত্র।স্বামী নেতৃত্ব দেবে ন্যায়, দয়া ও দায়িত্ববোধ দিয়ে। স্ত্রী হবে সহানুভূতিশীল, দীনদার ও সহযোগী। পারস্পরিক দাওয়াহ, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতাই পরিবারের শান্তির চাবিকাঠি।

৪.৩ ঘরে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা

একটি পরিবারের স্থিতি নির্ভর করে শান্তি ও ন্যায়ের উপর।যে ঘরে পারস্পরিক সম্মান, ক্ষমা ও দয়া বিরাজ করে সেই ঘরেই আল্লাহর রহমত নাজিল হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

"আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তির ঘরে।"
— (সূরা ইউনুস: ২৫)
অতএব, পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা মানে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, আর তার প্রথম ধাপ হলো ন্যায় ও সহনশীলতা।

- পরিবারের মাঝে ন্যায়ের প্রয়োজন

পরিবারে ন্যায় মানে হলো প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া ও কারও প্রতি অন্যায় না করা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"
— (সূরা হুজুরাত: ৯)
স্বামী যদি ন্যায়ের সঙ্গে নেতৃত্ব দেয় এবং স্ত্রীও দায়িত্ব পালন করে,তাহলে পরিবারে কলহ নয়, প্রশান্তি বিরাজ করে।

- দাম্পত্য জীবনে শান্তির চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে।” (সহীহ তিরমিজি: ৩৮৯৫)

এই হাদিস দাম্পত্য সম্পর্কের মূলনীতি যে পরিবারে সদাচরণ, মমতা ও ক্ষমার পরিবেশ তৈরি হয়,
সেই পরিবারেই প্রকৃত শান্তি আসে।

○ সারসংক্ষেপ

পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে হলে ন্যায়, সহিষ্ণুতা ও দয়া অপরিহার্য। দাম্পত্য সম্পর্কে সদাচরণ ও ক্ষমাশীলতা ঘরকে জান্নাতের উদ্যান বানায়। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিকামীদের ভালোবাসেন।

৪.৪ পরিবারে শিক্ষার ও নৈতিক গঠনের গুরুত্ব

পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
একজন সন্তানের চরিত্র, চিন্তা ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে ঘরের পরিবেশেই। সুতরাং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব সন্তানদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতমুখী সঠিক শিক্ষায় গড়ে তোলা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।” (সূরা আত-তাহরিম: ৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন পিতা-মাতা শুধু ভরণপোষণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের উপর আছে আত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার দায়িত্বও।

○ নবী ﷺ-এর পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন উত্তম শিক্ষক ও আদর্শ পিতা। তিনি সন্তান ও সাহাবিদের শুধু জ্ঞানের নয়, চরিত্রেরও শিক্ষা দিয়েছেন।
হাদিসে এসেছে—

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نِحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“পিতা তার সন্তানকে উত্তম আচরণের চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারে না।” (সহীহ তিরমিজি: ১৯৫২)

অতএব, পরিবারের ভেতরে আদব ও চরিত্রের চর্চা
দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপ।

◇ নৈতিক শিক্ষার প্রভাব

পরিবারে যদি নামাজ, সততা, দয়া ও পরহেযগারির চর্চা হয়,তাহলে সেই পরিবার থেকেই দীনদার সমাজ গড়ে ওঠে। রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ

“যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আহ্বান করে,
তার জন্য থাকবে অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব।”
— (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৪)

অতএব, সন্তানকে দীন শেখানো মানে
নিরবচ্ছিন্ন সওয়াবের দরজা খুলে দেওয়া।

◇ সারসংক্ষেপ

পরিবার হচ্ছে প্রথম মাদরাসা। পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু লালনপালন নয়, বরং নৈতিক শিক্ষা দান। আদর্শ শিক্ষা ও চরিত্রচর্চাই দীনদার সমাজের ভিত্তি।

■ অধ্যায় ৫: সমাজে দায়বদ্ধ ভূমিকা

৫.১ প্রতিবেশী ও কমিউনিটির কল্যাণে অবদান

একজন মুসলিম কেবল নিজের জন্য নয় সমাজ ও প্রতিবেশীর কল্যাণেও দায়বদ্ধ। ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সমাজে শান্তি, সহযোগিতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

“জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন। যে আমি ভেবেছিলাম, প্রতিবেশী হয়তো উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে।”
(সহীহ বুখারী: ৬০১৪, সহীহ মুসলিম: ২৬২৫)

এই হাদিসে স্পষ্ট বোঝা যায়,প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানের অংশ।

○ সমাজকল্যাণে ইসলামের আহ্বান

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা আল-মায়িদা: ২)

এ আয়াতের শিক্ষা হলো সমাজে একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতে সীমিত নয়; বরং অন্যের কল্যাণে এগিয়ে আসাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি,

যে অন্যদের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।"

— (আল-মু'জামুল আওসাত, সহীহ)

অতএব, প্রতিবেশীকে সহায়তা করা,কমিউনিটির সমস্যায় অংশগ্রহণ করা এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

সবই দায়বদ্ধতার পরিচয়।

○ সারসংক্ষেপ

প্রতিবেশী ও সমাজের কল্যাণে কাজ করা ঈমানের অংশ।

নেক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা সমাজে শান্তি আনে। প্রকৃত দায়ী ব্যক্তি কেবল দাওয়াতই নয়, বরং সমাজসেবা দ্বারাও ইসলামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৫.২ দরিদ্র, অসহায় ও এতিমদের প্রতি সদয় মনোভাব

প্রিয় পাঠক,

ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে,

যেখানে ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল—

সবাই পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ ও সহানুভূতিশীল।

মুমিন কেবল নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের কষ্টে অংশীদার হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

"তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার করায়।" (সূরা আল-ইনসান: ৮)

এই আয়াত প্রকাশ করে যে, একজন মুমিনের দান শুধু করুণা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মহান ইবাদত।

◇ দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করে,
আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেন।"
— (সহীহ বুখারী: ২৪৪২, সহীহ মুসলিম: ২৫৮০)

অর্থাৎ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সহায়তা করা
শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়, বরং আল্লাহর রহমত পাওয়ার উপায়।

◇ এতিমের যত্ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

"আমি এবং যে ব্যক্তি কোনো এতিমের দায়িত্ব নেয়,
আমরা জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকব।"
— (সহীহ বুখারী: ৫৩০৪)

এ হাদিসের মাধ্যমে নবী ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন,
এতিমের দায়িত্ব নেওয়া শুধু দয়া নয়, বরং জান্নাতের নৈকট্য অর্জনের উপায়।

◇ সামাজিক দায়বদ্ধতা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়কে দান করার।" (সূরা আন-নাহল: ৯০)

অতএব, সমাজে কল্যাণ ও দয়ার ভিত্তিই হলো ন্যায় ও ইহসান। দরিদ্র, অসহায় ও এতিমদের প্রতি যত্নবান হওয়া সমাজে শান্তি ও আল্লাহর বরকত আনে।

◇ সারসংক্ষেপ

দরিদ্র, এতিম ও অসহায়দের প্রতি সদয় আচরণ ঈমানের নিদর্শন। তাদের সহায়তায় অংশ নেওয়া আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পথ। যে সমাজে ইহসান, দয়া ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজেই প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে।

৫.৩ — ন্যায়, মানবিকতা ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

প্রিয় পাঠক,

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা কেবল ইবাদতের দিকনির্দেশনা দেয় না; বরং সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবিকতার ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে শেখায়।

কারণ, কোনো সমাজ তখনই টিকে থাকে, যখন সেখানে ন্যায়বিচার, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও পরস্পর শ্রদ্ধার পরিবেশ বিরাজ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়বিচার, সৎকর্ম ও আত্মীয়কে দান করতে, আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে।"

(সূরা আন-নাহল: ৯০)

এই আয়াতটি কুরআনের অন্যতম পরিপূর্ণ নৈতিক নির্দেশনা।এতে ন্যায়বিচার ও মানবিকতার সব দিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এ কারণেই উমর ইবনু আবদুল আজিজ (রহ.) এই আয়াতকে

"সমাজ পরিচালনার সারনিয়ম" বলেছেন।

○ ইসলামে ন্যায় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

ন্যায়বিচার হলো ইসলামী সমাজের ভিত্তি। যে সমাজে ন্যায় নেই, সেখানে শান্তি টেকেনা; আর যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে আল্লাহর বরকত ও রহমত বর্ষিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর অটল থেকো,

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধেই হয়।"

— (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

এই আয়াত আমাদের শেখায় ন্যায় মানে শুধু অন্যকে বিচার করা নয়, বরং নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেও সত্যের পাশে থাকা। একজন প্রকৃত দায়ী ইলাল্লাহ তাই কখনও পক্ষপাতিত্ব করে না; সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ন্যায়ের পতাকা উঁচু রাখে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِندَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ

"যারা ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে।"
— (সহীহ মুসলিম: ১৮২৭)
অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি শুধু দুনিয়ায় সম্মানিত নয়,
বরং আখিরাতে জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করবে।

○ মানবিকতা ও সামাজিক সহমর্মিতা

ইসলাম শুধু আইন ও ন্যায়ের ধর্ম নয়; এটি এক মানবিক জীবনবোধ, যেখানে মানুষে-মানুষে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মানের বন্ধন গড়ে ওঠে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ সত্যিকারের মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।" (সহীহ বুখারী: ১৩, সহীহ মুসলিম: ৪৫)
এই হাদিস ইসলামি মানবিকতার মূলনীতি একজন মুমিনের ভালোবাসা ও দয়া শুধু নিজের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সমাজ ও উম্মতের প্রতিও প্রসারিত হয়।

○ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ

ন্যায়বিচার ও মানবিকতা একসঙ্গে মিলেই সমাজে শান্তি আনে। কুরআন শান্তির সমাজ গড়ার জন্য তিনটি ভিত্তি নির্দেশ করেছে:
১. ন্যায় প্রতিষ্ঠা,
২. ইহসান বা দয়া,
৩. পরস্পর ক্ষমাশীলতা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

"আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তির ঘরে।"
— (সূরা ইউনুস: ২৫)

অতএব, সমাজে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন মানুষ অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হবে, ন্যায়ের পথে অটল থাকবে এবং হৃদয়ে দয়া ও ক্ষমা ধারণ করবে।

○ সারসংক্ষেপ

ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবিক আচরণ ইসলামি সমাজের ভিত্তি। ন্যায়বিচার শুধু প্রশাসনিক নয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও অপরিহার্য। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা মানে— প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহর সামনে দায়বদ্ধ থাকা। যে সমাজে ন্যায়, দয়া ও আল্লাহভীতি একসাথে বিরাজ করে, সেই সমাজই "দারুস সালাম"—শান্তির সমাজ।

৫.৪ সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার

প্রিয় পাঠক,

একটি সমাজ তখনই সুন্দর হয়, যখন তার ভিত্তি গড়ে ওঠে নৈতিকতা, দয়া ও দায়িত্ববোধের উপর। ইসলাম মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান নয়, বরং চরিত্র, আচরণ ও মূল্যবোধ গঠনের শিক্ষা দেয়। কারণ, জ্ঞান যদি নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তবে তা সমাজে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই ডেকে আনে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"নিশ্চয়ই সফল সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে; আর ব্যর্থ সে, যে তাকে কলুষিত করেছে।"

— (সূরা আশ-শামস: ৯–১০)

অর্থাৎ সমাজের সফলতা নির্ভর করে তার মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধতা ও নৈতিক উন্নতির উপর।

যখন মানুষ নিজের ভেতরের চরিত্রকে সংশোধন করে, তখন পুরো সমাজই আলোকিত হয়।

○ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি

ইসলামী মূল্যবোধের মূল হলো — তাকওয়া, সততা, ন্যায়, দয়া ও দায়িত্ববোধ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।"

— (সূরা হুজুরাত: ১৩)

তাকওয়া মানুষের আচরণে নিয়ন্ত্রণ আনে, আর সেই তাকওয়াই মানুষকে নৈতিক ও সামাজিকভাবে পরিপক্ক করে তোলে। যে সমাজে তাকওয়া ও সততা থাকে, সেখানে অন্যায় ও দুর্নীতি টেকে না।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

"আমি পাঠানো হয়েছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য।" (সহীহ বুখারী, আদাবুল মুফরাদ: ২৭৩, সহীহ)
অর্থাৎ নবী ﷺ-এর পুরো দাওয়াহ মিশনের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা।

◇ সমাজে নৈতিক শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব

একজন দায়ী ইলাল্লাহ কেবল মানুষকে নামাজ বা রোজার দিকে আহ্বান করে না, বরং তাদের অন্তরে সততা, ধৈর্য, দয়া ও সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলে।
একজন শিক্ষক, অভিভাবক কিংবা সমাজ নেতা
যখন নৈতিক শিক্ষার প্রচারে সচেষ্ট হয়,তখন সমাজে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত,
যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে।"
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)
এই আয়াত সমাজে দাওয়াহ ও নৈতিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে। যেখানে দাওয়াহ ও চরিত্র শিক্ষা মিলিত হয়, সেখানেই সত্যিকারের উন্নয়ন ঘটে।

◇ নৈতিকতার প্রভাব ও সামাজিক স্থিতি

যে সমাজে মানুষ একে অপরকে সম্মান করে, যেখানে প্রতারণার বদলে সততা, ঘৃণার বদলে ক্ষমা ও ভালোবাসা থাকে সেই সমাজেই প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"একজন মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারতের মতো,
যার একটি অংশ আরেকটি অংশকে শক্তিশালী করে।"
— (সহীহ বুখারী: ৪৮১, সহীহ মুসলিম: ২৫৮৫)

অতএব, নৈতিক শিক্ষার প্রচার কেবল ব্যক্তিগত নয়;
এটি সমাজের স্থিতিশীলতা ও ঐক্যের মূলভিত্তি।

○ সারসংক্ষেপ

নৈতিক শিক্ষা সমাজে ন্যায়, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা আনে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি তাকওয়া, সততা ও দয়া। দায়ী ব্যক্তি কেবল আহ্বানকারী নয়, বরং নৈতিকতার প্রচারকও বটে। সমাজে নৈতিকতার চর্চা যত গভীর হবে, আল্লাহর রহমতও তত বিস্তৃত হবে।

অধ্যায় ৬ : নারীর দাওয়াহিক ভূমিকা ও দায়িত্ব

৬.১ কুরআন ও সহীহ হাদিসে নারীর মর্যাদা ও দাওয়াহিক দায়িত্ব

ইসলাম মানবজাতির ইতিহাসে নারীর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ সম্মানে উন্নীত করেছে। যে যুগে নারীকে অবজ্ঞা, নির্যাতন ও সম্পত্তির অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো ইসলাম সেই নারীকেই দিয়েছে সম্মান, অধিকার এবং দায়িত্বের মহিমা।
ইসলাম নারীর দাওয়াহিক ভূমিকা নির্ধারণ করেছে পরিপূর্ণ মর্যাদা, হায়া ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে।

○ কুরআনের আলোকে নারীর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানের প্রতি মর্যাদা দান করেছি।"
— (সূরা ইসরা: ৭০)
এই মর্যাদা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।
আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার হয়ে সৎকাজ করে,
আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব।"
— (সূরা নাহল: ৯৭)
অতএব, ইসলাম নারীকে কেবল ইবাদতের অধিকারই দেয়নি, বরং তাকে আল্লাহর পথে আহ্বান (দাওয়াহ)-এর অংশীদারও করেছে। তার জীবন, জ্ঞান ও আচরণের মাধ্যমে সে সমাজে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে।

○ হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা ও দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর মর্যাদাকে অত্যন্ত উচ্চ আসনে স্থাপন করেছেন।
তিনি বলেছেনঃ

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“নারীরা পুরুষদের সহচর বা সমান অর্ধাংশ।”
— (আবু দাউদ: ২৩৬, তিরমিজি: ১১৩; সহীহ হাদিস)
এই হাদিস স্পষ্টভাবে দেখায় যে, নারী সমাজের অর্ধেক এবং উম্মাহ গঠনের অন্যতম স্তম্ভ। তাদের দ্বীনি দায়িত্বও পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ — আল্লাহর পথে আহ্বান করা, নেক কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী— তারা পরস্পরের সহায়;
তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা তাওবা: ৭১)
এই আয়াত প্রমাণ করে যে দাওয়াহ কেবল পুরুষের দায়িত্ব নয়; বরং নারীও সমানভাবে সমাজে সৎকাজের আহ্বান ও নৈতিকতা প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

○ নারীর দাওয়াহিক দায়িত্বের ক্ষেত্র

১. পরিবারে দাওয়াহ:
নারী পরিবারের শিক্ষক।
তিনি সন্তানদের মধ্যে ঈমান, সালাত, আদব ও আল্লাহভীতির বীজ রোপণ করেন।
তার চরিত্র ও আমলই সন্তান ও স্বামীর জন্য হয় বাস্তব দাওয়াহ।

২. নারী সমাজে দাওয়াহ:
নারীরা নিজেদের সমাজে — বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের মাঝে — নরম ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার করতে পারেন।

৩. শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে দাওয়াহ:
যে নারী দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে, সে তার শিক্ষার মাধ্যমে অন্য নারীদেরও আলোকিত করতে পারে।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“যে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য রয়েছে সেই কাজকারীর সমান সওয়াব।” (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩)

৪. নৈতিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দাওয়াহ:
কোনো নারী যদি নিজ জীবনে সততা, বিনয়, হায়া ও পর্দার অনুশীলন করে, তবে তার জীবন হয়ে ওঠে নীরব দাওয়াহ — যা অগণিত হৃদয়কে প্রভাবিত করে।

○ পর্দা ও দাওয়াহ

ইসলাম নারীদের দাওয়াহর ক্ষেত্রে হায়া ও পর্দাকে বাধা নয়, বরং সৌন্দর্য হিসেবে দেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো প্রদর্শন করো না।"
(সূরা আহযাব: ৩৩)
এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, নারীর দাওয়াহ হতে পারে ভাষায়, আচরণে, লেখায়, শিক্ষায় ও পরামর্শে —
কিন্তু তা কখনো লজ্জা ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করবে না।

○ সারসংক্ষেপ

ইসলাম নারীদের দাওয়াহর দায়িত্ব দিয়েছে মর্যাদা ও পর্দার সমন্বয়ে। নারী সমাজে নৈতিকতা, শিক্ষা ও দ্বীনের আলো ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম। দাওয়াহর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হলো — আমলের মাধ্যমে অন্যকে আহ্বান করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করাই নারী দায়ীর প্রকৃত সৌন্দর্য।

৬.২ নারীর দাওয়াহ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব

ইসলাম নারীকে যেমন সম্মান দিয়েছে, তেমনি দায়িত্বও দিয়েছে নিজেকে, পরিবারকে এবং সমাজকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার। একজন নারীর দাওয়াহর ক্ষেত্র পুরুষের চেয়ে সীমিত হলেও, প্রভাব ও গুরুত্বে কোনো অংশে কম নয়। তিনি যেভাবে কোমল ভাষা, জ্ঞান ও চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াহ প্রচার করেন, তা প্রজন্মের পর প্রজন্মে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

○ পারিবারিক দাওয়াহ: নারীর প্রথম দায়িত্ব

নারীর প্রথম ও প্রধান দাওয়াহ ক্ষেত্র তার পরিবার।
তিনি মা হিসেবে সন্তানদের মধ্যে ঈমান, তাকওয়া, আদব ও আল্লাহভীতির বীজ বপন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূরা তাহরিম: ৬)

এই আয়াতে বোঝা যায়, নারীর দায়িত্ব শুধু গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ নয় বরং সন্তানদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গঠনে তিনি দায়বদ্ধ। যে মা সকালে নামাযে ডাকে, কুরআনের আয়াত শেখায় এবং আল্লাহর ভয় মনে বসায় সে প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ।

◇ সমাজে দাওয়াহ: নৈতিকতা ও পরামর্শের মাধ্যমে

নারীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সমাজে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা। তিনি তাঁর বন্ধু, সহপাঠী, প্রতিবেশী ও নারী সমাজের মাঝে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে পারেন নরম ভাষায়, সুন্দর আচরণে ও দোয়ার মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি কাউকে ভালো কাজে আহ্বান করে,
সে ঐ কাজকারীর সমান সওয়াব পাবে।"
— (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩)

অতএব, একজন নারী যখন অন্য নারীকে পর্দা, সালাত, বা তাকওয়ার দিকে আহ্বান করে, তার সওয়াব হয় দাওয়াহকারীর সমান। এইভাবে তিনি সমাজে নীরব বিপ্লব ঘটান কোনো শোরগোল নয়, বরং চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে।

◇ সীমার ভেতর দাওয়াহর সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো প্রকাশ্যে নিজেদের প্রদর্শন করো না।" (সূরা আহযাব: ৩৩)

এই আয়াত দাওয়াহর সীমারেখা নির্ধারণ করেছে।

নারী তার দাওয়াহিক দায়িত্ব পালন করবেন পর্দা, বিনয় ও শালীনতার মধ্যে থেকে। তিনি শিক্ষা, কলম, পরামর্শ, অনলাইন কন্টেন্ট বা সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে দাওয়াহ দিতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাওয়াহে ইসলামি আদব ও সংযম বজায় থাকে।

◇ আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াহ ক্ষেত্র

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীদের সামনে নতুন দাওয়াহিক সুযোগ খুলে দিয়েছে।
একজন শিক্ষিকা তাঁর ক্লাসে, একজন চিকিৎসক তাঁর সেবায়, অথবা একজন লেখিকা তাঁর কলমের মাধ্যমে দাওয়াহ দিতে পারেন। তবে সবক্ষেত্রেই আদব, হায়া ও দীনদারিত্ব অপরিহার্য শর্ত। যে নারী এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, সে-ই প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ।

◇ সারসংক্ষেপ

নারীর দাওয়াহ শুরু হয় পরিবার থেকে, প্রসারিত হয় সমাজে। তাঁর দাওয়াহর শক্তি লুকিয়ে আছে জ্ঞান, আমল ও চরিত্রে। পর্দা, বিনয় ও হায়ার মধ্যে থেকেই নারী দাওয়াহের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। দাওয়াহর মাধ্যমে তিনি শুধু সমাজ নয়, প্রজন্মকেও আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

৬.৩ নারী সাহাবিদের দাওয়াহি অবদান

ইসলামের ইতিহাসে নারী সাহাবিয়াতদের ভূমিকা শুধু ঘর-সংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা ছিলেন দাওয়াহ, শিক্ষা, জিহাদ ও সমাজকল্যাণের অগ্রদূত।
তাদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিফলন, এবং তারা পরবর্তী প্রজন্মের নারী দায়ীদের জন্য জীবন্ত অনুপ্রেরণা।
১. খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা): প্রথম দাঈ ও সহযাত্রী
ইসলামী দাওয়াহর ইতিহাস শুরু হয় উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা.)-এর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রথম ওহি গ্রহণ করেন, তখন তিনিই সান্ত্বনা, আস্থা ও দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। তিনি শুধু নবীর স্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন প্রথম বিশ্বাসী, প্রথম সমর্থক, প্রথম দাঈ।
আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَرُزِقْتُ مِنْهَا الْوَلَدَ

“তিনি (খাদিজা) এমন এক নারী ছিলেন, যিনি সর্বদা আমাকে সহায়তা করেছেন, আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, এবং আল্লাহ আমাকে তাঁর মাধ্যমে সন্তান দান করেছেন।” (সহীহ বুখারী: ৩৮২১)

খাদিজা (রা.) নিজের সম্পদ দ্বীনের দাওয়াহে ব্যয় করেন, রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেন এবং সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াহের অংশ হন। তাঁর ত্যাগ ও সমর্থন ছাড়া ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ এত দ্রুত বিস্তার লাভ করতো না।

○ ২. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা): জ্ঞানের দাওয়াহ
আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে জ্ঞানী নারী।
তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও সামাজিক বিধান বিষয়ে শত শত সাহাবি ও তাবেয়িনকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২২০০টিরও বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে (সহীহ সূত্রে)।
ইমাম যুহরী (রহ.) বলেনঃ
“যদি সাহাবাদের জ্ঞান এক পাশে রাখা হয় এবং আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞান অন্য পাশে রাখা হয়, তবে আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানই অধিক হবে।”
(তাবাকাত ইবনু সা‘দ: ৮/৫৯)

আয়েশা (রা.) নারী সাহাবিদের জন্য ছিলেন আলোর উৎস। তিনি নারীদের ফিকহ, পর্দা, পবিত্রতা ও গৃহজীবনের আদব শেখাতেন। এভাবেই তিনি নারীদের মাঝে দ্বীনি সচেতনতা ও দাওয়াহর বীজ বপন করেন।

○ ৩. ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা): আদর্শ দায়িত্বশীল দাঈ ফাতিমা (রা.), নবী ﷺ-এর কনিষ্ঠ কন্যা, ছিলেন দাওয়াহ ও ত্যাগের প্রতীক। তিনি পরিবারের মধ্যেই দাওয়াহর সেরা উদাহরণ স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য, লজ্জাশীলতা ও আল্লাহভীতির মূর্ত প্রতীক।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

“ফাতিমা আমারই অংশ; তাকে কষ্ট দিলে আমাকেও কষ্ট দেওয়া হয়।” (সহীহ বুখারী: ৩৭১৪, সহীহ মুসলিম: ২৪৪৯)
তিনি নিজের জীবনযাপনকে সরল, ঈমানি ও নৈতিক আদর্শে গড়ে তোলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক দাওয়াহিক প্রেরণা। তাঁর জীবন প্রমাণ করে — নারী নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেই পুরো সমাজ আলোকিত হয়।

○ ৪. উম্মে আম্মারা (নুসাইবা বিনতে কা‘ব রা.): সাহসী দাওয়াহ উম্মে আম্মারা (রা.) ছিলেন এমন এক সাহাবিয়া, যিনি শুধু মুখের দাওয়াহেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না;
বরং ইসলামের রক্ষা ও দাওয়াহর ময়দানে বাস্তব সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন, নিজের শরীরে আঘাত পেয়েও পিছু হটেননি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ

مَا الْتَفَتُّ يَوْمَ أُحُدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا رَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ دُونِي

“উহুদের দিনে আমি ডান বা বাম যেদিকেই তাকিয়েছি,
উম্মে আম্মারাকে আমাকে রক্ষা করতে যুদ্ধরত দেখেছি।”
— (সীরাত ইবনু হিশাম, খণ্ড ৩, পৃ. ৭৮)
তিনি শুধু যুদ্ধেই নয়, ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর দৃঢ়তা প্রমাণ করে, নারীও ঈমান ও সাহসের মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাঈ হতে পারে।

◇ ৫. উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা): প্রজ্ঞা ও উপদেশের দাওয়াহ উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ নারী। তিনি নবী ﷺ-কে একাধিকবার উপদেশ দিয়েছেন, যা ইসলামী ইতিহাসে নীতিগত শিক্ষা হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন— হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির সময় সাহাবিরা দ্বিধায় পড়লে, উম্মে সালামা (রা.) নবী ﷺ-কে পরামর্শ দেন নিজের মাথা মুন্ডিয়ে কুরবানির কাজ শুরু করতে, যাতে সাহাবিরা অনুসরণ করেন।
এই জ্ঞানপূর্ণ পরামর্শ পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়।
এটি ছিল নারী দাওয়াহকারীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

◇ সারসংক্ষেপ

নারী সাহাবিয়াতরা ইসলামের দাওয়াহ ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা কখনো সম্পদ দিয়ে, কখনো জ্ঞান দিয়ে, কখনো পরামর্শ বা সাহসিকতার মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের জীবন আমাদের শেখায় — দাওয়াহ মানে শুধু কথা বলা নয়, বরং নিজেকে দ্বীনের জীবন্ত উদাহরণে রূপান্তর করা।

৬.৪ আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াহে সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ

ইসলাম নারীকে জ্ঞান ও দাওয়াহের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছে, তবে সেই ভূমিকা সর্বদা পর্দা, আদব ও শালীনতার সীমারেখার মধ্যে থাকা জরুরি।
আধুনিক যুগে, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও যোগাযোগের বিস্তারের কারণে নারীর দাওয়াহিক ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ।
এই অধ্যায়ে আমরা সেই সীমাবদ্ধতা ও সুযোগগুলো কুরআন, সহীহ হাদিস ও বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করব ইন শা আল্লাহ।

◇ আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াহর সীমাবদ্ধতা

১.পর্দা ও হায়ার অবহেলা:

আধুনিক সমাজে নারী স্বাধীনতার নামে পর্দার গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে। অসংখ্য নারী দ্বীনের আহ্বান দিতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন মাধ্যমে জড়িয়ে পড়েন, যেখানে চেহারা, কণ্ঠস্বর ও সামাজিক উপস্থিতি অতিরিক্ত প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো প্রকাশ্যে নিজেদের প্রদর্শন করো না।" (সূরা আহযাব: ৩৩)

অতএব, নারী দায়ীর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো — দাওয়াহর সময় শালীনতা, নম্রতা ও পর্দা বজায় রাখা।

২. সামাজিক সমালোচনা ও ভুল ধারণা:

দাওয়াহর ময়দানে নারীরা অনেক সময় সামাজিক সমালোচনার মুখে পড়েন। কেউ ভাবেন, নারী দাওয়াহ মানেই সমাজচ্যুতি; আবার কেউ ভুল ধারণায় মনে করেন, নারী শিক্ষা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ইসলাম এ দুই অবস্থানকেই ভারসাম্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৩. অনলাইন ও মিডিয়া বিভ্রান্তি: আজকের ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াহর এক বড় ক্ষেত্র হলেও,

এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কোনো নারী যদি পর্দা, গোপনীয়তা ও নিয়তের বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেন,

তবে তার দাওয়াহ বরং ফিতনার কারণ হতে পারে।

- আধুনিক যুগে নারীর দাওয়াহর সুযোগ

১. শিক্ষার মাধ্যমে দাওয়াহ:

বর্তমান যুগে নারীরা স্কুল, মাদরাসা, অনলাইন ক্লাস ও ইসলামিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে অসংখ্য নারীর জীবনে পরিবর্তন আনছেন। যেমন: মিসর, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে নারী আলেমারা কুরআন শিক্ষা ও ফিকহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

২. লেখালেখি ও সাহিত্য মাধ্যমে দাওয়াহ: নারীরা কলমের মাধ্যমে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন বই, ব্লগ, আর্টিকেল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামি সাহিত্য রচনা করে। যেমন, প্রখ্যাত

আলিমা ড. আয়েশা আবদুর রহমান (বেনতুশ-শাতি) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে শত শত নারীর দ্বীনজীবনে প্রভাব ফেলেছেন।

৩. সামাজিক সেবা ও মানবিক কাজ: ইসলাম নারীদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। নারী দায়ীরা স্বাস্থ্য, দান, শিক্ষা ও শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কাজ করে সমাজে ইসলামী চেতনা জাগাতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি,
যে অন্য মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।"
— (মুসনাদ আহমদ: ২৩৪০৯, সহীহ সনদে বর্ণিত)

৪. ডিজিটাল দাওয়াহ ও ইসলামী কনটেন্ট:

আধুনিক প্রযুক্তি নারীদের জন্য দ্বীনের প্রচারে এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। পডকাস্ট, ভিডিও ক্লাস, ইসলামিক ওয়েবসাইট সব জায়গায় নারীরা শালীনভাবে অংশ নিতে পারেন, যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সীমারেখা সংরক্ষণ।

◇ নারী দায়ীর আদর্শ দাওয়াহর নীতিমালা

নিয়তের বিশুদ্ধতা: দাওয়াহ যেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। পর্দা ও হায়া রক্ষা: কথায়, পোশাকে ও উপস্থিতিতে শালীনতা বজায় রাখা। জ্ঞানের ভিত্তি: কুরআন, সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে বক্তব্য প্রদান। ধৈর্য ও সহনশীলতা: দাওয়াহর পথে সমালোচনা ও কষ্টকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা।

◇ সারসংক্ষেপ

আধুনিক যুগে নারীদের দাওয়াহর সুযোগ অনেক বিস্তৃত, তবে ফিতনার ঝুঁকিও বেড়েছে। পর্দা, নিয়ত ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারই দাওয়াহর নিরাপদ পথ। নারী দায়ীরা হায়া ও জ্ঞানের সমন্বয়ে উম্মাহর অর্ধেককে আলোকিত করতে পারেন।

■ অধ্যায় ৭ : আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা

৭.১ তাকওয়া, ইখলাস ও আত্মসংযম

আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতা হলো সেই অভ্যন্তরীণ শক্তি যা একজন মুমিনকে আল্লাহর স্মরণে স্থির রাখে, গোনাহ থেকে দূরে রাখে, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাকওয়া, ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা) ও আত্মসংযম — এই তিনটি গুণ একজন মুসলিমের ঈমানকে দৃঢ় করে, দাওয়াহকে ফলপ্রসূ করে, এবং তাকে আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান বানায়।

- তাকওয়া — আল্লাহভীতির বাস্তব রূপ

তাকওয়া অর্থ: আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার কারণে গোনাহ থেকে দূরে থাকা। এটি কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়; বরং অন্তরের এমন এক জাগরণ, যা মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে সচেতন করে তোলে— “আমাকে আমার রব দেখছেন।”
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সোজাসাপ্টা কথা বলো; আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং গুনাহ মাফ করবেন।”
— (সূরা আহযাব: ৭০–৭১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتَ

“যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো।”
— (তিরমিজি: ১৯৮৭; সহীহ হাদিস)
তাকওয়া মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও আচরণে পরিশুদ্ধতা আনে। যার অন্তরে তাকওয়া থাকে, সে একা থাকলেও গোনাহ থেকে বিরত থাকে এবং দাওয়াহর কাজে সত্যনিষ্ঠ হয়।

- ইখলাস — নিয়তের বিশুদ্ধতা

ইখলাস অর্থ: আমল ও দাওয়াহ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যে দায়ী মানুষ প্রশংসা, জনপ্রিয়তা বা প্রশংসার লোভে কাজ করে, তার দাওয়াহ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“কর্মসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভর করে, এবং প্রত্যেকের জন্য থাকবে সে যা নিয়ত করেছে।”

— (সহীহ বুখারী: ১; সহীহ মুসলিম: ১৯০৭)
ইখলাস এমন এক গুণ যা দাওয়াহকে প্রাণবন্ত করে তোলে। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাঁর কথা ও কাজকে মানুষের হৃদয়ে প্রভাবশালী করে দেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“তাদেরকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন খাঁটি মনে আল্লাহর ইবাদত করে।”
— (সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫)

◇ আত্মসংযম — নৈতিক দৃঢ়তার মূল

আত্মসংযম হলো নিজের আবেগ, রাগ, লোভ ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই গুণ ছাড়া তাকওয়া বা ইখলাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

“যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।” (সূরা আন-নাজিয়াত: ৪০–৪১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

“শক্তিশালী ব্যক্তি সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে।”
— (সহীহ বুখারী: ৬১১4; সহীহ মুসলিম: ২৬০৯)
আত্মসংযমের মাধ্যমে মানুষ অহংকার থেকে মুক্ত হয়, অন্যের প্রতি সদয় হয়, এবং দাওয়াহর ক্ষেত্রে নম্রতা ও সহনশীলতা অর্জন করে।

◇ তাকওয়া, ইখলাস ও আত্মসংযম — তিনটি গুণের পারস্পরিক সম্পর্ক

এই তিনটি গুণ একে অপরের পরিপূরক। তাকওয়া মানুষকে গোনাহ থেকে দূরে রাখে, ইখলাস তার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে, আর আত্মসংযম তাকে ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত বানায়। একজন দায়ী ইলাল্লাহ যদি এই তিন গুণ অর্জন করেন, তবে তার দাওয়াহ হবে প্রভাবশালী, তার চরিত্র হবে অনুসরণযোগ্য, এবং তার জীবন হবে আখিরাতে মুক্তির পথপ্রদর্শক।

○ সারসংক্ষেপ

তাকওয়া হলো ঈমানের ঢাল; ইখলাস হলো আমলের প্রাণ; আত্মসংযম হলো চরিত্রের সৌন্দর্য। এ তিনটি গুণ ছাড়া কোনো দায়ী বা মুসলিম ব্যক্তি সফল হতে পারে না।
আল্লাহভীতি, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ — এই তিন গুণেই নিহিত আধ্যাত্মিক সাফল্য।

৭.২ ইবাদতের মাধ্যমে দায়বদ্ধতার চর্চা

ইবাদত হলো মানুষের আধ্যাত্মিক দায়িত্ববোধের বাস্তব অনুশীলন। এটি কেবল নামায, রোযা বা হজের মতো আনুষ্ঠানিক কাজ নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
যে ব্যক্তি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে, সে ধীরে ধীরে নিজের ভেতরে দায়িত্ব, আত্মসংযম ও তাকওয়ার গভীর অনুভূতি গড়ে তোলে।

○ ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"
— (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)
এই আয়াত প্রমাণ করে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দায়িত্বশীল বান্দা হিসেবে —
যে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং জীবনের প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করবে।
ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ শিখে নেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়ের মর্যাদা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা — যা তাকে একজন দায়িত্বশীল মুমিনে রূপ দেয়।

○ নামায: জবাবদিহির অনুশীলন
নামায হলো বান্দা ও আল্লাহর সরাসরি সম্পর্কের প্রতীক।
এটি শুধু দেহের ক্রিয়া নয়; বরং আত্মার পরিশুদ্ধি।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত: ৪৫)

এই আয়াত বোঝায়, নামায শুধু ইবাদত নয়, বরং নৈতিক দায়বদ্ধতার এক প্রশিক্ষণ। যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করে, সে নিজের চরিত্রে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও আত্মসংযম অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟

সাহাবারা বললেন: না।

তিনি বললেনঃ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

"এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে দেন।"

— (সহীহ বুখারী: ৫২৮; সহীহ মুসলিম: ৬৬৭)

অতএব, নামায একজন মুসলিমকে পাপ থেকে দূরে রাখে, আর দায়িত্ববোধে শক্ত করে তোলে।

- ○ রোযা: আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ

রোযা হলো তাকওয়া ও আত্মসংযমের বিদ্যালয়।
এতে বান্দা শিখে নেয় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কামনা নিয়ন্ত্রণ করা;
যা জীবনের সবক্ষেত্রে আত্মসংযমের ভিত্তি তৈরি করে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে,
যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল,
যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন কর।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

অতএব, রোযা শুধু খাদ্য থেকে বিরত থাকা নয়,
বরং নিজেকে নফস, রাগ, গিবত, মিথ্যা ও গোনাহ থেকে বিরত রাখার প্রশিক্ষণ।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহর তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই।"

— (সহীহ বুখারী: ১৯০৩)

- ○ যাকাত ও দান: সামাজিক দায়িত্বের চর্চা

যাকাত মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। এটি অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রদের সহায়তার মাধ্যমে দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যা তাদের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে।" (সূরা আত-তাওবা: ১০৩)

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে,

সে শুধু দুনিয়ার ভারসাম্যই রক্ষা করে না, বরং নিজের অন্তরকেও শুদ্ধ করে।

- হজ ও জিকির: ঐক্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা

হজ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক; আর জিকির হলো হৃদয়ের প্রশান্তি।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"স্মরণ রেখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি পায়।"

— (সূরা রা'দ: ২৮)

নিয়মিত জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে বান্দা নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করে, যা তার চিন্তা ও কাজকে দায়িত্বশীল করে তোলে।

- সারসংক্ষেপ

ইবাদত কেবল আনুষ্ঠানিক নয় — এটি জীবনের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার প্রশিক্ষণ। নামায শৃঙ্খলা শেখায়, রোযা আত্মসংযম শেখায়, যাকাত সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখায়। নিয়মিত ইবাদত মানুষকে আত্মিকভাবে শক্তিশালী ও নৈতিকভাবে দৃঢ় করে।

৭.৩ আমানত রক্ষা, জবাবদিহি ও পরকালীন দায়িত্ববোধ

ইসলামে "আমানত" শব্দটি শুধু সম্পদ বা বস্তুগত দায়িত্ব নয়; বরং এটি বিশ্বাস, দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি—

যা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এক গভীর বন্ধন।

প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক নেতা, এমনকি প্রতিটি মুসলিমই একটি আমানতের ভার বহন করছে, যার জবাবদিহি একদিন করতে হবে আল্লাহর সামনে।

- আমানতের ধারণা:-

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ

"নিশ্চয়ই আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার ওপর আমানত প্রস্তাব করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানায় ও ভয় পায়, কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়।" (সূরা আল-আহযাব: ৭২)
এই আয়াতে স্পষ্ট বোঝা যায় মানুষ যে দায়িত্ব ও স্বাধীনতা পেয়েছে, সেটিই এক বিশাল আমানত।
এ আমানতের অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশ মানা, মানুষের অধিকার রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

◇ রাসূল ﷺ-এর বাণী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারিত্ব নেই, তার ঈমান নেই;
আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার ধর্মও নেই।"
— (মুসনাদ আহমাদ: ১২৫০৬; সহীহ সনদে বর্ণিত)

এই হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে অমানতহীনতা মানে ঈমানহীনতা। অর্থাৎ দায়িত্বে অবহেলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ সবই আল্লাহর কাছে কঠিন অপরাধ।

◇ জবাবদিহির বোধ

একজন মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি হলো "জবাবদিহি"
সে জানে, তার প্রতিটি কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে রেকর্ড হচ্ছে, আর একদিন তাকে সব কিছুর হিসাব দিতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে;
আর যে অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা আয-যিলযাল: ৭–৮)
এই আয়াত মানুষের অন্তরে এক গভীর আত্মসমালোচনা সৃষ্টি করে। সে বুঝে নেয়— তার প্রতিটি কথা, কাজ, দায়িত্ব ও আচরণ একদিন বিচার হবে।

◇ দায়িত্বশীলতার উদাহরণ

খুলাফায়ে রাশেদীনদের জীবনে ছিল জবাবদিহির এক মহান চেতনা।
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলতেনঃ
"যদি ইউফরাত নদীর তীরে একটি খচ্চর হোঁচট খায়,

আমি আশঙ্কা করি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন,
'উমর! কেন তার জন্য পথ সমান করে দাওনি?'"
এই উক্তি প্রকাশ করে, একজন নেতা বা দায়ী ব্যক্তি কতখানি সংবেদনশীল ছিলেন দায়িত্ব পালনে।

◇ পরকালীন জবাবদিহি

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ:

"কিয়ামতের দিন বান্দার দুই পা সরবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ের জবাব দিতে হবে
(১) তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে,
(২) তার জ্ঞান দিয়ে কী করেছে,
(৩) তার সম্পদ কোথায় থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে,
(৪) তার দেহ কীভাবে ব্যবহার করেছে।"
— (সহীহ তিরমিজি: ২৪১৭; সহীহ সনদে বর্ণিত)
এটি এমন এক বাস্তব শিক্ষা, যা প্রতিটি মুমিনকে সতর্ক করে দেয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দায়িত্বই জবাবদিহির অংশ।

◇ সারসংক্ষেপ

আমানত হলো দায়িত্ব, যা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এক পবিত্র অঙ্গীকার। আমানতের ভঙ্গ ঈমানের ক্ষতি ডেকে আনে, তাই একজন দায়ীর উচিত সর্বদা সত্য, ন্যায় ও সততায় অবিচল থাকা। জবাবদিহির অনুভূতি মানুষকে সৎ, সচেতন ও দায়িত্ববান রাখে। একজন প্রকৃত মুসলিম জানে তার প্রতিটি কাজ একদিন আল্লাহর দরবারে প্রকাশিত হবে।

■ অধ্যায় ৮: আধুনিক জীবনে দায়বদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৮.১ প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম ও তথ্য ব্যবহারে নৈতিকতা

আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।এটি যেমন জ্ঞান, দাওয়াহ ও কল্যাণ প্রচারের সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি অপব্যবহার ও অনৈতিকতার মাধ্যমে সমাজে বিভ্রান্তি ও ক্ষতির কারণও হয়েছে। একজন মুমিন দায়ী

ইলাল্লাহ হিসেবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে দায়িত্ব ও তাকওয়ার সঙ্গে, কারণ ইসলাম শিখিয়েছে — প্রতিটি কাজেরই হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে।

◇ তথ্য ব্যবহারে দায়িত্ব ও সত্যবাদিতা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করো, যাতে অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে ফেলো এবং পরে তা নিয়ে অনুতপ্ত না হও।"

— (সূরা আল-হুজরাত: ৬)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দেয়। আজ ফেসবুক, টেলিগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদিতে অগণিত তথ্য ছড়ায়

যার অনেকটাই মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ। একজন দায়ীর কর্তব্য হলো, প্রত্যেক সংবাদ, পোস্ট বা বক্তব্য যাচাই করে তবেই শেয়ার করা। কারণ মিথ্যা প্রচার শুধু গোনাহ নয়, বরং সমাজে বিশৃঙ্খলার দরজা খুলে দেয়।

◇ গিবত, অপবাদ ও অশালীন কনটেন্ট থেকে বিরত থাকা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

كفى بالمرءِ كذبًا أن يُحَدِّثَ بكلِّ ما سمعَ

"মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট সে যা কিছু শোনে, সবকিছুই বলে ফেলে।" (সহীহ মুসলিম: ৫)

এই হাদিসে সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বহীন প্রচারের ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে। মিথ্যা খবর, কারো ব্যক্তিগত সম্মানহানি বা অপবাদ ছড়ানো মুমিনের চরিত্রের সঙ্গে কখনো মানানসই নয়।

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَن كانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে বা চুপ থাকে।"

(সহীহ বুখারী: ৬১৩৬; সহীহ মুসলিম: ৪৭)

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য সামাজিক মাধ্যমেও

ভাষা, মন্তব্য ও শেয়ার করা বিষয়বস্তুতে নৈতিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

◇ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

প্রযুক্তি হলো এক বিশাল নিয়ামত — যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী শিক্ষা, দাওয়াতি বার্তা প্রচার, দরিদ্রদের সহায়তার উদ্যোগ সবকিছুই এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি অন্যকে কল্যাণের দিকে নির্দেশ করে,তার জন্যও সেই কাজকারীর সমান সওয়াব আছে।"
(সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩)
অতএব, প্রযুক্তি ব্যবহার হবে "খায়ের দাওয়াতের" হাতিয়ার হিসেবে, না যে তা গোনাহ ও বিভ্রান্তির মাধ্যম হয়।

- সময় ব্যবহারে ভারসাম্য

আধুনিক জীবনে প্রযুক্তি মানুষকে অলসতা, আসক্তি ও সময় নষ্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একজন দায়িত্বান মুসলিম সময়কে আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখে।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামত আছে, যেগুলোর মূল্য মানুষ নষ্ট করে ফেলে— সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময়।" (সহীহ বুখারী: ৬৪১২)
এই হাদিস প্রতিদিনের সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রযুক্তি যেন সময় নষ্ট না করে, বরং জ্ঞান ও আমলের উন্নতিতে সহায়ক হয় এটাই একজন দায়ীর দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব।

- সারসংক্ষেপ

সামাজিক মাধ্যমে সত্য যাচাই ছাড়া কিছু প্রচার করা গুনাহের কাজ। কথাবার্তায় শালীনতা, সংযম ও সত্যবাদিতা রক্ষা করা ইমানের শর্ত। প্রযুক্তি হলো নিয়ামত, তবে সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এটি ফিতনা হয়ে ওঠে। একজন দায়ী ইলাল্লাহ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে দাওয়াত, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে।

৮.২ সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার

সময় ও সম্পদ এই দুই নিয়ামত এমন মূল্যবান আমানত,

যার সঠিক ব্যবহার একজন মুমিনের ঈমান, আমল ও সফলতার প্রতিচ্ছবি। ইসলাম শেখায়, মানুষের জীবনকাল সীমিত; তাই প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করাই প্রকৃত দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

- সময়ের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সময়ের নামে

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"শপথ সময়ের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।"
— (সূরা আল-আসর: ১–২)
এই সংক্ষিপ্ত আয়াতেই আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্বকে অসীম মর্যাদা দিয়েছেন।
ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেছেন —
"যদি মানুষ কেবল সূরা আল-আসর নিয়ে চিন্তা করত, তাহলেই তা তার জন্য যথেষ্ট হতো।"
অর্থাৎ, সময়ের সঠিক ব্যবহারই মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি।

- সময়ের সঠিক ব্যবহার একজন দায়ীর বৈশিষ্ট্য

দায়ী ইলাল্লাহ জানে — সময় হলো জীবনের মূল পুঁজি।
প্রতিটি মুহূর্ত দাওয়াহ, শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও সেবায় ব্যবহার করাই তার দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ :شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"পাঁচ জিনিসের আগেই পাঁচ জিনিসের কদর করো:
তোমার যৌবন বার্ধক্যের আগে, স্বাস্থ্য অসুস্থতার আগে,
সম্পদ দারিদ্র্যের আগে, অবসর ব্যস্ততার আগে, আর জীবন মৃত্যুর আগে।"
(সহীহ হাকিম, মুসনাদে আহমাদ: ৯০৫২)
এই হাদিস সময় ব্যবস্থাপনা ও অগ্রাধিকার বোধের এক গভীর শিক্ষা। একজন দায়ীর প্রতিটি দিন পরিকল্পিত ও লক্ষ্যনির্ভর হওয়া উচিত কারণ সময় অপচয় মানে জীবনের ক্ষয়।

- সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার

সম্পদ হলো আল্লাহর দেওয়া আমানত। এর সঠিক ব্যবহার যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি অপব্যবহার বা অপচয় গোনাহের কারণ।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৬–২৭)

এই আয়াত মানুষকে ব্যয়ের ভারসাম্য শেখায়। অর্থ, সময় ও শ্রম — সবকিছুর হিসাব আল্লাহর সামনে দিতে হবে।
তাই একজন মুমিন কৃপণ নয়, আবার অপব্যয়ীও নয়;
সে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করে।

◇ সাদাকাহ ও দাওয়াহে সম্পদ ব্যয়

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ

"যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে,
তাদের দৃষ্টান্ত সেই বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক শীষে একশত দানা থাকে।"
— (সূরা আল-বাকারা: ২৬১)

এখানে সম্পদের মাধ্যমে দাওয়াহ, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
একজন দায়ী জানে — তার সম্পদ তখনই বরকতময় হয়,
যখন তা আল্লাহর পথে ব্যয় হয়।

◇ সময় ও সম্পদের অপচয়: এক গোপন ক্ষতি

প্রযুক্তি, বিনোদন, অলসতা ও অনর্থক আলোচনা আজ সময় নষ্টের প্রধান কারণ।
রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেনঃ

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ...عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ

"কিয়ামতের দিন বান্দা তার সম্পদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে।" (সহীহ তিরমিজি: ২৪১৭)
অতএব, সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার শুধু দুনিয়ার সাফল্য নয়, বরং আখিরাতের মুক্তিরও চাবিকাঠি।

◇ সারসংক্ষেপ

সময় ও সম্পদ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক পবিত্র আমানত। একজন দায়ী ইলাল্লাহ সময়কে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবে। অলসতা, অপব্যয় ও বিলাসিতা দাওয়াহি দায়িত্ব পালনের অন্তরায়।
তাই সচেতনতা, মিতব্যয়িতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ — এ তিনটি গুণ একজন দায়িত্ববান মুমিনের পরিচায়ক।

৮.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ, দেশপ্রেম ও উম্মাহর ঐক্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ—তিনটির মধ্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে।
একজন দায়িত্ববান মুসলিম শুধু নামায বা রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার দায়িত্ব বিস্তৃত হয় প্রকৃতি, দেশ ও উম্মাহর কল্যাণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীর খলিফা বানিয়েছেন অর্থাৎ, এমন প্রতিনিধি যিনি ন্যায়, সংরক্ষণ ও একতার মাধ্যমে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন।

◇ পরিবেশ সংরক্ষণ: একটি ঈমানি দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"পৃথিবীতে সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।"
— (সূরা আল-আরাফ: ৫৬)
এই আয়াত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দেয়।
পানি, গাছ, প্রাণী ও মাটি — সবই আল্লাহর সৃষ্টি,
এগুলোর সুরক্ষা ও অপচয় রোধ করা একজন মুমিনের দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

"রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও এক প্রকার সদকা।" (সহীহ বুখারী: ২৮২৭; সহীহ মুসলিম: ১০০৯)
অতএব, গাছ লাগানো, পানি সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

◇ দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ব

ইসলাম মানুষকে নিজ দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববান হতে উৎসাহিত করেছে। রাসূল ﷺ তাঁর মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগকালে বলেনঃ

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَحَبُّ بِلادِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী, তোমার লোকেরা আমাকে যদি বের না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"
(সুনান তিরমিজি: ৩৯২৫; সহীহ সনদে বর্ণিত)
এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় — দেশপ্রেম ইসলামসম্মত,

তবে তা আল্লাহর বিধানবিরোধী না হলে। একজন দায়ী নাগরিক আইন মেনে চলে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে,
এবং অন্যদের কল্যাণে কাজ করে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর ন্যায় ও তাকওয়ার কাজে, কিন্তু গোনাহ ও অন্যায়ে সহযোগিতা করো না।”
— (সূরা আল-মায়িদাহ: ২)
দেশ ও সমাজে এই সহযোগিতা মনোভাবই দায়বদ্ধতার বাস্তব রূপ।

◇ উম্মাহর ঐক্য: দাওয়াহর মূল ভিত্তি

ইসলাম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই।”
— (সূরা আল-হুজরাত: ১০)
ঐক্যই উম্মাহর শক্তি। বিভেদ ও হিংসা মুসলিম সমাজকে দুর্বল করে দেয়।
রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেনঃ

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, কে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না;
তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও।”
— (সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪)
একজন দায়ী ইলাল্লাহর কর্তব্য হলো, উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর শ্রদ্ধা ও দাওয়াহি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

◇ সারসংক্ষেপ

পরিবেশ সংরক্ষণ হলো ঈমানের অংশ এবং আল্লাহর আমানত রক্ষার দায়িত্ব। দেশপ্রেম ইসলামি দৃষ্টিতে বৈধ, যদি তা ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিতে হয়। উম্মাহর ঐক্যই মুসলিম জাতির শক্তি ও দাওয়াহর সাফল্যের মূলে।
একজন দায়ী তার জীবন, সময়, পরিবেশ ও সমাজ — সবক্ষেত্রে ভারসাম্য ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখবে।

■ অধ্যায় ৯: নেতৃত্ব, শিক্ষা ও দাওয়াহর প্রভাব

৯.১ ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বের নীতি

ইসলাম নেতৃত্বকে ক্ষমতা বা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নয়, বরং আমানত ও দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। একজন নেতা শুধু শাসক নয়; তিনি জনগণের জন্য দায়ী, ন্যায়বিচারের প্রতীক, এবং সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধি। নেতৃত্ব ইসলামে এমন এক দায়িত্ব, যা কিয়ামতের দিন জবাবদিহির অন্যতম কঠিন বিষয় হবে।

◇ নেতৃত্ব একটি আমানত

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত তাদের হাতে অর্পণ করো, যারা এর যোগ্য, এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করো, ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করো।”

— (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

এই আয়াত নেতৃত্বের মূলনীতি হিসেবে দুটি বিষয় নির্দেশ করে —

১. দায়িত্ব যথাযথ ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা,

২. শাসন বা নেতৃত্বে ন্যায়ের অনুসরণ করা।

নেতৃত্বের পদ হলো এমন এক আমানত, যা শুধুমাত্র যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে দেওয়া বৈধ।

◇ রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের মডেল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এমন নেতা, যিনি ছিলেন নম্র, ন্যায়পরায়ণ ও পরামর্শপ্রিয়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“এটা আল্লাহর রহমত যে আপনি তাঁদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেছেন।আপনি যদি কঠোর ও রূঢ় হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।”

— (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

এই আয়াত প্রকাশ করে একজন প্রকৃত নেতা কখনো কঠোর নয়; তিনি দয়া, নম্রতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন।

রাসূল ﷺ আরও বলেছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল রাখাল,
এবং প্রত্যেকেই তার অধীনদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।” (সহীহ বুখারী: ৮৯৩; সহীহ মুসলিম: ১৮২৯)
এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে নেতৃত্ব হলো দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধান, কর্তৃত্ব নয়।

◇ নেতৃত্বে ন্যায় ও পরামর্শের গুরুত্ব
ইসলামে ন্যায়বিচার নেতৃত্বের ভিত্তি।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।”
— (সূরা আল-মায়িদাহ: ৪২)
রাসূল ﷺ সর্বদা সিদ্ধান্ত নিতেন শূরা (পরামর্শ)-এর মাধ্যমে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“তাদের কার্যাবলী হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।”
— (সূরা আশ-শুরা: ৩৮)
এই নীতি অনুযায়ী নেতৃত্বে একচ্ছত্রতা নয়, বরং পরামর্শ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা অপরিহার্য।
◇ ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের প্রতিদান
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ...وَإِمَامٌ عَادِلٌ

“সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না তাদের একজন হলো ‘ন্যায়পরায়ণ শাসক।’”
(সহীহ বুখারী: ৬৬০; সহীহ মুসলিম: ১০৩১)
এই হাদিস নেতৃত্বে ন্যায়বিচার ও আল্লাহভীতির মর্যাদা বোঝায়।
◇ সারসংক্ষেপ
নেতৃত্ব হলো দায়িত্ব, গৌরব নয়; এটি আল্লাহর আমানত।
যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ ও পরামর্শপ্রিয় নেতৃত্ব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। রাসূল ﷺ ছিলেন দয়ার ও ন্যায়ের প্রতীক; তাঁর নেতৃত্বই ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠ মডেল। একজন দায়ী ব্যক্তি যখন নেতৃত্বে আসবে, তার প্রথম দায়িত্ব হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জনগণের ন্যায়বিচার।

৯.২ নবী ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বমূলক শিক্ষা

ইসলামী ইতিহাসে সর্বোত্তম নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি খোলাফায়ে রাশেদীনদের জীবনে। তাঁদের নেতৃত্ব কেবল রাজনৈতিক শাসন নয়, বরং ন্যায়, তাকওয়া, বিনয় ও জনগণের কল্যাণের এক জীবন্ত মডেল। তাঁদের জীবন থেকে শেখা যায়— নেতৃত্ব মানে নিজেকে সবার সেবক হিসেবে উপস্থাপন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে একমাত্র লক্ষ্য ধরা।

○ নবী ﷺ-এর নেতৃত্ব: দয়া, ন্যায় ও নম্রতার আদর্শ
রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এমন নেতা যিনি ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষকে পরিচালিত করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ, সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে।" (সূরা আহযাব: ২১)
তিনি কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি; বরং ক্ষমা ও দয়ার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর চরিত্রে এমন নম্রতা ছিল, যা সবচেয়ে কঠিন মানুষকেও নরম করে তুলেছিল। মক্কা বিজয়ের সময় নবী ﷺ বিজয়ী সেনাপতি হয়েও মাথা নিচু করে দয়া ও বিনয়ের সঙ্গে শহরে প্রবেশ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেনঃ
"আজ কোনো প্রতিশোধ নেই, আজ ক্ষমা ও মুক্তি।"
— (ইবনু হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১)
এটাই ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য — ক্ষমতার সঙ্গে করুণা ও ন্যায়ের সমন্বয়।
○ হযরত আবু বকর (রাযি.) — নেতৃত্বে বিনয় ও ঈমানের দৃঢ়তা খিলাফতে আসীন হওয়ার পর তাঁর প্রথম ভাষণ ছিল দায়িত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণঃ
"হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে আমি নেতা হয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি সঠিক পথে থাকলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো, আর যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে আমাকে সংশোধন করো।"
— (তারীখ তাবারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২০)
এ বক্তব্য প্রমাণ করে— একজন সত্যিকারের ইসলামী নেতা কখনো অহংকারী হন না; তিনি জনগণের জবাবদিহিতার কাছে নিজেকে দায়ী মনে করেন।
○ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) — নেতৃত্বে ন্যায় ও জবাবদিহি:- হযরত উমর (রাযি.) ছিলেন ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতীক।

তিনি বলেছিলেনঃ
“যদি ইউফরাত নদীর তীরে একটি খচ্চর হোঁচট খায়,
আমি আশঙ্কা করি, আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন — ‘উমর! কেন তার পথ সমান করনি?’”
(ইবনু কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৭)
তাঁর শাসনকাল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ন্যায় ও সমতার সোনালী অধ্যায়। তিনি রাতের আঁধারে বের হয়ে মানুষের অবস্থা দেখতেন, ক্ষুধার্তদের খাবার দিতেন,
এবং প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তাকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন।

◇ হযরত উসমান (রাযি.) — ত্যাগ ও দানশীলতার নেতৃত্ব
তিনি ছিলেন এমন নেতা, যিনি সম্পদ ব্যয় করে উম্মাহর কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। “বীর রোউমা” নামের কূপটি মুসলমানদের জন্য তিনি নিজ অর্থে কিনে দান করেন, যা আজও তাঁর সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে প্রবাহমান।
রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেনঃ
مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ
“আজকের পর উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি হবে না।” (সহীহ তিরমিজি: ৩৭০১)
এই হাদিস তাঁর ত্যাগ ও ঈমানের স্বীকৃতি বহন করে।

◇ হযরত আলী (রাযি.) — প্রজ্ঞা, সাহস ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের এক অনন্য নেতা। তিনি বলেছিলেনঃ
“যে ব্যক্তি নিজের নফসকে শাসন করতে পারে না, সে কখনো অন্যদের সঠিকভাবে শাসন করতে পারবে না।”
— (নাহজুল বালাগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২)
তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চা, বিচারবোধ ও দাওয়াহি দায়িত্ব আরও সুসংহত হয়।

◇ সারসংক্ষেপ
নবী ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে দয়া, ন্যায়, ত্যাগ ও আত্মসংযমের সমন্বয় ছিল। তাঁরা প্রমাণ করেছেন— নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়, বরং দায়িত্ব, সেবা ও বিনয়। ইসলামী নেতৃত্বের মূলনীতি হলো: ন্যায়, জবাবদিহি, পরামর্শ ও তাকওয়া। বর্তমান দাওয়াহি সমাজের নেতৃত্বেও এই গুণাবলি পুনরুজ্জীবিত করা আবশ্যক।

৯.৩ শিক্ষা, দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারের সম্পর্ক

শিক্ষা, দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কার এ তিনটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দেয়, দাওয়াহ সেই জ্ঞানকে কর্মে রূপ দেয়, আর সমাজ সংস্কার সেই কর্মের মাধ্যমে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম শিক্ষা ও দাওয়াহকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়,
বরং গোটা মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে প্রবর্তন করেছে।

◇ জ্ঞানের মর্যাদা ও দাওয়াহর ভিত্তি

আল্লাহ তাআলা প্রথম যে শব্দটি নাজিল করেছেন, তা হলো "ইকরা" (পড়ো) যা জ্ঞানের প্রতি ইসলামের গভীর আহ্বান নির্দেশ করে।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— (সূরা আল-আলাক: ১)

এই আয়াত প্রমাণ করে, শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জনের নাম নয়; বরং তা হলো আল্লাহকে চেনা, তাঁর বিধান বোঝা, এবং মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

— (সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯)

অতএব, শিক্ষা হলো দাওয়াহর প্রথম ধাপ; কারণ যে জানে না, সে কাউকে আল্লাহর পথে আহ্বানও করতে পারে না।

◇ দাওয়াহর উদ্দেশ্য: জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ

দাওয়াহ হলো জ্ঞানকে কর্মে পরিণত করার প্রক্রিয়া।

এটি এমন এক শিক্ষা, যা শুধু তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়;

বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র — পরিবার, সমাজ, ব্যবসা, রাষ্ট্র — সব জায়গায় নৈতিক পরিবর্তন আনে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমতের মাধ্যমে ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা।"

— (সূরা আন-নাহল: ১২৫)

এই আয়াত দাওয়াহর মৌলিক শিক্ষা দেয় জ্ঞান (হিকমাহ), নৈতিকতা ও ধৈর্যের সমন্বয়ে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা।

◇ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

শিক্ষা সমাজের মূল ভিত্তি। যে সমাজ জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী, সে সমাজ নৈতিকতা, দয়া ও ন্যায়ের ক্ষেত্রেও উন্নত।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না — তারা কি সমান?" (সূরা আয-যুমার: ৯)

এই আয়াত সমাজে শিক্ষার প্রভাব বোঝায়। অশিক্ষা ও অজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় অন্যায়, কুসংস্কার ও বিভেদ;

অন্যদিকে জ্ঞান সৃষ্টি করে সভ্যতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা।

◇ নবী ﷺ ও সাহাবাদের শিক্ষা আন্দোলন

রাসূল ﷺ দাওয়াহর পাশাপাশি সর্বদা শিক্ষা প্রচারে গুরুত্ব দিয়েছেন। মাদিনায় "সুফফা" নামক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে সাহাবারা কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও জীবনের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতেন। হযরত উমর (রাযি.) প্রতিটি অঞ্চলে ক্বারি ও শিক্ষক পাঠিয়েছিলেন যাতে মানুষ কুরআনের আলোয় নিজেদের সমাজ গঠন করতে পারে। এই শিক্ষা আন্দোলনের ফলেই মুসলিম উম্মাহ কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায় ও সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে।

◇ শিক্ষা, দাওয়াহ ও সংস্কারের একীকরণ

একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন—

১. শিক্ষা, যা আল্লাহভীতির ভিত্তিতে মানুষকে জ্ঞানের আলো দেয়;

২. দাওয়াহ, যা সেই জ্ঞানকে প্রচার করে;

৩. সংস্কার, যা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনে।

তিনটি ক্ষেত্র একত্রে কাজ করলে তৈরি হয় একটি দায়িত্বশীল ও আলোকিত সমাজ।

◇ সারসংক্ষেপ

শিক্ষা হলো দাওয়াহর ভিত্তি, দাওয়াহ হলো জ্ঞানের ব্যবহার, আর সমাজ সংস্কার হলো তার ফলাফল।

ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবারা প্রমাণ করেছেন — জ্ঞান ও দাওয়াহ একত্রে সমাজে আলো ছড়ায়। একজন দায়ী ব্যক্তির কাজ হলো, জ্ঞানার্জন, তা প্রচার, এবং সমাজে সেই আলো ছড়িয়ে দেওয়া।

■ অধ্যায় ১০: শিক্ষণীয় বার্তা, উপসংহার ও সুপারিশ

১০.১ কুরআন ও সহীহ হাদিস থেকে অন্তর্দৃষ্টি

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদিস কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের উৎস নয়, বরং এগুলোই মানুষের জীবন, সমাজ ও নেতৃত্বের সর্বোত্তম দিকনির্দেশক। একজন দায়ী ইলাল্লাহর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এই দুটি উৎসের আলোতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

◇ কুরআনের দৃষ্টিতে দায়বদ্ধতা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার স্মরণ করিয়েছেন—
মানুষ পৃথিবীতে একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রতিনিধি (খলিফা):

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি।"
— (সূরা আল-বাকারা: ৩০)

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, বরং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। এই প্রতিনিধিত্ব মানে দায়িত্ব, নেতৃত্ব ও আমানতের ভার।
আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"প্রত্যেক প্রাণ তার অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ।"
— (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩৮)

এই আয়াত মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি কাজ, কথা ও সিদ্ধান্তের হিসাব একদিন দিতে হবে। এটাই কুরআনের শিক্ষা— দায়িত্ব ও জবাবদিহি একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

◇ হাদিসের আলোকে দায়িত্ববোধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপে দায়বদ্ধতার শিক্ষা দিয়েছেন।
তিনি বলেছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল রাখাল, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"
— (সহীহ বুখারী: ৮৯৩; সহীহ মুসলিম: ১৮২৯)

এই হাদিস কেবল নেতাদের জন্য নয়; বরং প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিবারে, কর্মস্থলে, সমাজে ও দাওয়াহর ময়দানে।
আরেকটি হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

"যে মুমিন মানুষের সঙ্গে মিশে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে,
সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং কষ্ট সহ্য করে না।" (সহীহ ইবনু মাজাহ: ৪০৩২)
এই হাদিস আমাদের শেখায় দাওয়াহ, দায়িত্ব ও
সমাজসেবা সবই ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

○ কুরআন ও হাদিস থেকে শিক্ষা

১.দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি — প্রত্যেক মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী।
২. ন্যায় ও পরামর্শ — নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তে ন্যায়পরায়ণতা অপরিহার্য।
৩. তাকওয়া ও ধৈর্য — দাওয়াহর পথে ধৈর্য হলো সাফল্যের চাবিকাঠি।
৪. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য — উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা ইসলামী দায়িত্বের অংশ।
৫. ইখলাস ও আমানত — আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করাই প্রকৃত দায়বদ্ধতার মূল।

○ সংক্ষিপ্ত প্রতিফলন

কুরআন ও হাদিস একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের দিকনির্দেশক। একজন দায়ী যখন কুরআনের আলোয় চিন্তা করে এবং হাদিসের নির্দেশ মেনে চলে,
তখন তার জীবন হয় ন্যায়, দয়া ও কল্যাণের প্রতিফলন।
দায়িত্ব তখন কেবল একটি কর্তব্য নয়, বরং তা হয়ে ওঠে ইবাদত যার ফল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তি।

১০.২ নবী ﷺ, সাহাবা ও তাবেয়িনদের জীবন থেকে শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবা এবং তাবেয়িনদের জীবনই ইসলামী দায়িত্ববোধ, দাওয়াহ ও আত্মত্যাগের জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাঁদের জীবন থেকে আমরা শিখি— কীভাবে একজন দায়ী আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, ধৈর্য, ইখলাস ও আমানতের সঙ্গে সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে তাঁরা দায়িত্বকে বোঝা নয়, বরং সম্মান ও ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

○ নবী ﷺ: দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ছিল সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও দাওয়াহে নিবেদিত তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উম্মাহর কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত। তিনি তায়েফে রক্তাক্ত শরীরে দাওয়াহ দিয়েছেন, উহুদে আহত হয়েও সাহাবাদের রক্ষা করেছেন,এবং প্রতিটি বিপদে বলেছেনঃ
اللهم اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়াত দিন, তারা জানে না।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৭৭)
এই দোয়া প্রমাণ করে, একজন দায়ী মানুষ কখনো রাগ বা হতাশায় নয়, বরং দয়ার হৃদয় নিয়ে মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে।

◇ সাহাবাদের জীবন থেকে দায়িত্বের শিক্ষা

হযরত আবু বকর (রাযি.) — ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতীক

তিনি ছিলেন এমন খলিফা, যিনি দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেনঃ "যদি আমি সত্যের পথে থাকি, আমাকে সহায়তা করো; আর যদি আমি ভুল করি, আমাকে সংশোধন করো।" (তারীখ তাবারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২০) তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দাওয়াহ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সমাজকল্যাণ সবকিছুতে ছিলেন বিনয়ী ও জবাবদিহিমূলক নেতা।
হযরত উমর (রাযি.) — ন্যায়বিচারের আদর্শ
তিনি বলেছিলেনঃ
"আমি ভয় করি, যদি কোনো পশু ক্ষুধায় মারা যায়,
আল্লাহ উমরকে প্রশ্ন করবেন — কেন তাকে খাদ্য জোগাওনি?" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৭) তিনি রাতে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরে দায়িত্ব পালন করতেন; তাঁর শাসনে ন্যায়, সমতা ও মানবিকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

হযরত উসমান (রাযি.) — দানের নেতৃত্ব
তিনি সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে প্রমাণ করেছেন
দায়িত্ব মানে কেবল শাসন নয়, বরং আত্মত্যাগ। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর অর্থ, সময় ও জীবন সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন।

হযরত আলী (রাযি.) — প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের প্রতীক
তাঁর নেতৃত্বে সমাজে শিক্ষা ও ফিকহের বিকাশ ঘটে।
তিনি বলতেনঃ
"যে নিজের নফসকে শাসন করতে পারে না,
সে অন্যদের সঠিকভাবে শাসন করতে পারবে না।"
— (নাহজুল বালাগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২)

◇ তাবেয়িনদের জীবন: দাওয়াহর ধারাবাহিকতা

তাবেয়িনেরা ছিলেন সাহাবাদের উত্তরসূরি,
যারা দায়িত্ব ও জবাবদিহির মর্মবাণী বাস্তবে ধারণ করেছিলেন। হাসান আল-বাসরি (রহ.) বলতেনঃ
"দায়িত্ব পালনের সময় যে আল্লাহকে স্মরণ রাখে,
তার বিচার হবে সহজ; কিন্তু যে মানুষকে খুশি করতে গিয়ে দায়িত্ব ভুলে যায়, তার হিসাব হবে কঠিন।"
(আল-যুহদ, ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ২২৫)
তাদের জীবন আমাদের শেখায় একজন দায়ী কখনো ফলের অপেক্ষা করে না, বরং দায়িত্ব পালন করে সন্তুষ্ট থাকে এই বিশ্বাসে যে, "আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।"

○ সারসংক্ষেপ

নবী ﷺ ও সাহাবাদের জীবন হলো দাওয়াহ, ত্যাগ ও দায়িত্বের বাস্তব রূপ। তাঁদের জীবন থেকে শিখি — নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা নয়, বরং সেবা ও ত্যাগ। তাবেয়িনদের উদাহরণ দেখায় — দায়িত্বের প্রকৃত মাপকাঠি হলো ইখলাস ও আল্লাহভীতি। একজন দায়ী ইলাল্লাহর উচিত তাঁদের জীবনকে আদর্শ মানে নিজেকে গঠন করা —
কারণ তার সফলতা নির্ভর করে কতটা আন্তরিকভাবে সে দায়িত্ব পালন করছে তার উপর।

তথ্যসূত্র:

১. সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৩৪৭৭।
২. তারীখ তাবারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২০।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৪. নাহজুল বালাগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২।
৫. ইমাম আহমাদ, আল-যুহদ, পৃষ্ঠা ২২৫।
৬. শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ, সীরাতুল খোলাফা ও দাওয়াহর শিক্ষা, দারুস সালাম পাবলিকেশন।

১০.৩ গবেষণার সারসংক্ষেপ ও বাস্তব প্রয়োগের দিকনির্দেশ

○ গবেষণার সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল "আমরা কিরূপ দায়ী হবো" এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। পুরো থিসিসের আলোচনার সারমর্মে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি করেছে। মানুষকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন, যাতে সে আল্লাহর আদেশ মান্য করে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ

প্রতিষ্ঠা করে। দায়িত্ববোধ শুরু হয় ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে, তারপর তা পরিবার, সমাজ, দেশ এবং উম্মাহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গবেষণায় দেখা যায় একজন দায়ী ইলাল্লাহর সবচেয়ে বড় গুণ হলো ইখলাস, তাকওয়া ও ধৈর্য। কুরআন ও সহীহ হাদিসে বারবার এই তিনটি বিষয়কেই দায়িত্বশীল জীবনের মূল ভিত্তি বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করে,
সে-ই সমাজকে বদলাতে পারে। এটাই ইসলামী দায়িত্ববোধের কেন্দ্রবিন্দু।

○ বাস্তব প্রয়োগের দিকনির্দেশ

১. ব্যক্তিগত জীবনে:
প্রত্যেক মুমিনের উচিত নিজের আমল ও সময়ের হিসাব রাখা।
হাদিসে এসেছে—
“কিয়ামতের দিন মানুষ পাঁচ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে—
তার জীবন কোথায় কাটাল, যৌবন কী কাজে ব্যয় করল,
সম্পদ কীভাবে অর্জন করল এবং ব্যয় করল, ও অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করল।”
(তিরমিজি: ২৪১৬)
এই হাদিসে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার পূর্ণ কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি সময়ের ব্যবহার আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

২. পারিবারিক জীবনে:
একজন দায়ী তার পরিবারের সামনে আদর্শ হোক।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” (সূরা আত-তাহরিম: ৬)
অতএব, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা, নামাযে অনুপ্রেরণা ও আল্লাহভীতি শেখানো এগুলোই ইসলামী দায়িত্বের প্রথম ধাপ।

৩. সামাজিক জীবনে:
সমাজে ন্যায় ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করা হলো দায়ীর কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে সহায়তা করে,
আল্লাহ তার প্রয়োজনে সহায়তা করেন।”(সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯)
এখান থেকে বোঝা যায়, একজন দায়ী সমাজে কেবল কথা বলেন না, বরং মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়ান।

৪. দাওয়াহ ও নেতৃত্বে:
দাওয়াহ মানে শুধু প্রচার নয়, বরং জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তব রূপ প্রদর্শন করা। নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়, বরং সেবকসুলভ দায়িত্ব পালন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ
“নেতা হলো রাখাল, আর সে তার অধীনদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।” (সহীহ বুখারী: ৮৯৩)
এ হাদিস প্রতিটি দায়ীর জন্য স্মরণযোগ্য
কারণ নেতৃত্ব যত বড়, দায়িত্বও তত গভীর।

- প্রয়োগিক নির্দেশনা

প্রতিদিন ৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন আত্মসমালোচনার জন্য আমি আজ কীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছি? পরিবার ও সমাজে ইসলামিক শিক্ষা প্রসারে অন্তত একটি ভালো উদ্যোগ নিন।দাওয়াহ ও আমলকে আলাদা নয়, বরং সমন্বিত জীবনধারায় পরিণত করুন। মিডিয়া, প্রযুক্তি বা লেখার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান। সর্বোপরি, নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হোন, কারণ আল্লাহ বলেন —“প্রত্যেক প্রাণী তার অর্জিত কাজের জন্য দায়ী।” (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩৮)

১০.৪ চূড়ান্ত অঙ্গীকার ও ব্যক্তিগত আত্মসমালোচনার দিক।

চূড়ান্ত অঙ্গীকার: দায়িত্বশীল এক জীবন

মানুষের জীবন আসলে একটি আমানত। যার মালিক আল্লাহ তাআলা, আর আমরা শুধু তাঁর প্রতিনিধি।
আমরা পৃথিবীতে এসেছি সময়, জ্ঞান ও সামর্থ্যের পরীক্ষায় অংশ নিতে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই দরকার আত্মসমালোচনা, ইখলাস ও দায়িত্ববোধ।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন— তোমরা তোমাদের আমানত তাদের নিকট পৌঁছে দাও, যাদের নিকট তা পৌঁছানো উচিত।” (সূরা আন-নিসা: ৫৮)
এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, প্রতিটি দায়িত্ব হোক তা পরিবারের, সমাজের, দাওয়াহর বা ব্যক্তিগত আমলের—
সবই একটি আমানত, যার হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —
«...لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ»

“কিয়ামতের দিন বান্দার দুই পা সরে যাবে যতক্ষণ না তাকে চার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে: তার জীবন, যৌবন, সম্পদ ও জ্ঞান সম্পর্কে।” (তিরমিজি: ২৪১৬)

অতএব, প্রকৃত দায়ী সেই ব্যক্তি, যে প্রতিটি কাজে নিজের নফসকে প্রশ্ন করে— “আমি কি এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইছি?

- আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চিন্তা করে দেখে, সে আগামী দিনের (আখিরাতের) জন্য কী প্রস্তুত করেছে।(সূরা আল-হাশর: ১৮)

এই আয়াতই ইসলামী আত্মসমালোচনার ভিত্তি।

একজন দায়ী প্রতিদিন নিজের কর্ম, উদ্দেশ্য ও নিয়্যাত পর্যালোচনা করে। সে নিজের ভুলে অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে, উন্নতির চেষ্টা চালায়। কারণ আত্মসমালোচনা ছাড়া কোনো দায়বদ্ধতা পরিপূর্ণ হতে পারে না।

ইমাম হাসান আল-বাসরি (রহ.) বলেছেনঃ

“একজন মুমিন তার নফসকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে —
আজ আমি কী আমল করলাম? কী অবহেলা করলাম?”
— (আল-যুহদ, ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ২২৮)

এটাই আসলে দাওয়াহ ও দায়িত্ববোধের মর্ম—
নিজেকে সংশোধন, তারপর সমাজকে সংশোধন।

- দায়িত্বশীল মুমিনের জীবনধারা

একজন দায়িত্বশীল মুমিনের জীবন পাঁচটি মূল নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকেঃ

১. ইখলাস: সব কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।
২. ইস্তিকামাহ: দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকা, বিপদেও ভেঙে না পড়া।
৩. তাওয়াক্কুল: ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা।
৪. আদল ও আমানাহ: ন্যায়বিচার করা ও দায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকা।
৫. তাওবা ও আত্মসমালোচনা: ভুল বুঝে ফেরত আসা ও উন্নতির চেষ্টা করা।

এই পাঁচটি গুণ একজন দায়ীকে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত করে, আর সমাজে তাকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমাপ্ত বার্তাঃ

এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়
“আমরা কেবল নিজের জন্য নই, বরং মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি।” আমাদের দায়িত্ব কেবল কথা নয়, বরং আমল ও আচরণে ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা।
যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পালন করে, তার সামান্য প্রচেষ্টাও আল্লাহর কাছে অমূল্য।
কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন —
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
“যে সামান্য পরিমাণও ভালো কাজ করবে, সে তা দেখবে;
আর যে সামান্য পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখবে।” (সূরা যিলযাল: ৭–৮)
অতএব, আজই আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা নিজেদের, আমাদের পরিবার, সমাজ ও উম্মাহর প্রতি দায়বদ্ধ হবো;
আমাদের প্রতিটি শ্বাস হবে আমানতের অংশ,এবং প্রতিটি কাজ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

- দোয়া

اللهم اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم،
ووفقنا لأداء الأمانة كما تحب وترضى.

“হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি করে দাও,এবং আমাদেরকে তোমার প্রিয় সেইভাবে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দাও।”

শেষ কথা:

এই থিসিস কেবল গবেষণাপত্র নয়, বরং জীবনের আহ্বান। একজন মুমিন কিরূপে দায়ী, সে যেন তা বুঝে নেয়, বাঁচে এবং পৌঁছে দেয়। “আমরা কিরূপ দায়ী হবো” — এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের প্রতিটি আমলে, প্রতিটি নিয়্যাতে।

তথ্যসূত্র

ক. কুরআন ও হাদিসের সূত্র

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬

৩. সূরা আল-বাকারা: ৩০
৪. সূরা আল-মুলক: ২
৫. সূরা আর-রহমান: ২৬–২৭
৬. সূরা আলে ইমরান: ১১০
৭. সূরা আন-নাহল: ১২৫
৮. সূরা আন-নিসা: ৫৮
৯. সূরা আত-তাহরিম: ৬
১০. সূরা আল-হাশর: ১৮
১১. সূরা যিলযাল: ৭–৮
১২. সূরা আল-আনআম: ১৬২
১৩. সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩৮

১৪. সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৩৪৬১, ৮৯৩, ৩৪৭৭
১৫. সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৮২৯, ২৬৯৯
১৬. তিরমিজি: হাদিস নং ২৪১৬

খ. ইসলামী গ্রন্থ ও বাংলা বই

১. ইমাম ইবনু কাসির (রহ.)। তাফসিরুল কুরআনিল আজিম। বৈরুত: দারুল ফিকর।
২. ইমাম নববী (রহ.)। রিয়াদুস সালেহীন। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৩. ইমাম বুখারী (রহ.)। সহীহ আল-বুখারী। রিয়াদ: দারুস সালাম পাবলিকেশন।
৪. ইমাম মুসলিম (রহ.)। সহীহ মুসলিম। রিয়াদ: দারুস সালাম পাবলিকেশন।
৫. ইমাম গাজ্জালী (রহ.)। ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন। বৈরুত: দারুল ফিকর।
৬. মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। দাওয়াতের আহ্বান। লাহোর: ইসলামিক পাবলিকেশন।
৭. ইউসুফ আল-কারদাওয়ী। দাওয়াতের মূলনীতি ও পদ্ধতি। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৮. মাওলানা মতি উর রহমান মাদানী। দাওয়াতি জীবনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। ঢাকা: শিখা পাবলিকেশন।
৯. শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ। আল-আমানাহ ওয়াল-মাসউলিয়্যাহ ফিল ইসলাম। রিয়াদ: দারুস সালাম।
১০. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল। আল-যুহদ। রিয়াদ: মাকতাবাতুল উবাই কান।

১১. ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ। আল-ফাওয়ায়েদ। দারুস সালাম, রিয়াদ।
১২. ইমাম কুরতুবি। আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ।
১৩. মাওলানা মাহমুদুর রহমান। ইসলামী দাওয়াতের সামাজিক প্রয়োগিকতা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন রিসার্চ সিরিজ।
১৪. মাওলানা আবুল কালাম। বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াতি আন্দোলন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাবলিকেশন।
১৫. শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ। আল-মাসউলিয়্যাহ ফিল ইসলাম। মাকতাবাতুল মানার, দামেস্ক।
১৬. হাসান আল-বাসরি (রহ.)। আল-হিকম ওয়াল-মাওয়ায়েজ। কায়রো: দারুস সালাম।
১৭. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ। আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম। রিয়াদ: দারুস সালাম।

গ. ইংরেজি তথ্যসূত্র

১৮. Al-Qurtubi, Abu Abdullah. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
১৯. Al-Ghazali, Imam. Ihya Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Fikr.
২০. Sa'id Hawwa. Tariq al-Da'wah ila Allah. Damascus: Dar al-Salam.
২১. Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Da'wah fi al-Islam. Cairo: Dar al-Shorouk.
২২. Al-Fawzan, Saleh. The Reality and Method of Da'wah. Riyadh: Maktabat al-'Ubaikan.
২৩. Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. The Correct Method of Da'wah. Damascus: Maktabatul-Islam.
২৪. Rahman, S. (2017). Islamic Propagation and Modern Barriers. International Journal of Islamic Research, Malaysia.
২৫. Islam, M. T. (2018). Da'wah Challenges in Contemporary Bangladesh: A Sociological Overview. Journal of Islamic Studies, University of Dhaka.
২৬. Chowdhury, A. H. (2021). Use of Media in Islamic Da'wah: A Modern Approach. Journal of Contemporary Islamic Thought, UK.

ঘ. অনলাইন সূত্র

২৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
🔗 https://www.islamicfoundation.gov.bd
(অ্যাক্সেসের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫)।

২৮. আল-জাজিরাহ ইসলামিক পোর্টাল।
🔗 https://www.aljazeera.net/islam
(অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।

২৯. International Islamic Research Foundation (IRF)।
🔗 https://www.irf.net
(অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।

৩০. Islamic Online University (IOU)।
🔗 https://www.islamiconlineuniversity.com
(অ্যাক্সেসের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫)।

৩১. Al-Islam Web Portal — Islamic Articles and Research Center.
🔗 https://www.islamweb.net
(অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।